ত্রৈমাসিক

বর্ষ : ৫ | সংখ্যা : ২০ | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ২০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
সুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৬০৫২৭
মোবাইল : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, ০১৯১৭-১৯১৩৯৩, ০১৯১৬-৫৯৪০৭৯
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA ৮৮৭২
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : মডার্ন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ১৯৫ ফকিরাপুল (৩য় তলা), (১ম গলি) ঢাকা।

দাম : ৪০ টাকা US $ 3

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 40 US $ 3.

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর- ডিসেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠা ৫-৮

<u>*সম্পাদকীয়*</u>

আইনের আশ্রয়ে আইনের অবমাননা করা হচ্ছে

আইন সভ্যতার প্রতীক। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানুষ সভ্য এবং প্রথম দিন থেকেই আইনের অনুগত। প্রথমে যে দুজন মানুষ পৃথিবীতে আসেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রেরণকারী আল্লাহর আইনের অনুগত থাকেন। সমাজ সভ্যতা আইন তিনটি তাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজ সভ্যতা তারা তৈরি করেন, আইন তাদেরকে দেয়া হয়। বরং বলা যায় আইনের মাধ্যমে তারা সমাজ ও সভ্যতাকে পরিশীলিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। প্রথম মানুষ তথাকথিত বন্য ও অসভ্য ছিলেন না। বরং তারা মাথা ঘামিয়ে চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেকটি কাজ করতেন। তারা আল্লাহর আইনের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। আল্লাহর আইনের অমর্যাদা করে প্রথম যে ভুলটি তারা করেন সেজন্য তারা অনুতপ্ত হন এবং এ থেকে কিভাবে আইন মেনে চলতে হয় সে শিক্ষা লাভ করেন।
তাঁরা বলেন, 'হে আমাদের রব! আমরা আইন ভঙ্গ করে নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। আর এই আইন ভঙ্গ করার যে স্বাধীন ক্ষমতা আমাদের আছে যদি তুমি তা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের না বাঁচাও তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।' (আল-'আরাফ ঃ ২৩)
এভাবে পৃথিবীতে মানুষের সত্তা তার রবের সত্তার সহযোগিতায় আইনের যথাযথ আনুগত্য করে এগিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়। পদে পদে মানুষ ভুল করে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। পৃথিবীতে মানুষের জীবন হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। একজন মানুষের জীবন একশো বছর বা তার চেয়ে কিছু কম বেশি। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর ধারাবাহিক সিলসিলা এই একশো বছরকে সুদীর্ঘকালে পরিণত করেছে। কালের আঙিনায় একজনের থেকে আরেক জন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেই চলেছে। তাই আজকের একজন মানুষের জীবন কেবল একজন মানুষের নয় বরং সমগ্র মানবতার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। আর মানুষের এই অভিজ্ঞতা আইনের শৃংখল পরিবেষ্টিত। মানুষ পদে পদে আইন তৈরি করেছে আবার ভঙ্গ করেছে। আইন বহির্ভূত পথে যে মানুষ চলতে গিয়েছে তার পক্ষে জনমত সায় দেয়নি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ এবং মাৎসন্যায়ও দেখা গিয়েছে। কিন্তু তা ছিল সাময়িক। তার কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। একদলের পরে আর এক দল এবং এক জাতির পরে আর এক জাতি। অন্তর্বর্তীকালে হয়তো কিছুটা অনিয়ম হতে পারে। কিন্তু মানুষ আবার আইন ও শৃংখলায় ফিরে এসেছে। এটাই মানবিক ঐতিহ্য। এটাই

আল্লাহর নিয়ম। 'এভাবে আল্লাহ যদি মানুষদের একদলের সাহায্যে অন্যদলকে প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় দেখা দিতো। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের প্রতি আল্লাহর অপার করুণা (যে, তিনি এভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করেন)।' [আল-বাকারা : ২৫১] 'আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে দিয়ে অন্যদলকে প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খৃস্ট্রীয় সংসার, বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেখানে বেশি বেশি স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর ব্যবস্থাপনাকে) সাহায্য করে। আল্লাহ অবশ্যই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।' (আল হাজ্জ : ৪০)

মানুষের ইতিহাস আইন ভঙ্গ করার নয়, আইন মেনে চলার ইতিহাস। কিন্তু মানুষ কৌশলে আইন অমান্য করে। এর পরিণামও হয় ভয়াবহ। আল্লাহ আইন করে দিলেন, ইহুদিরা শনিবার মাছ ধরবে না। কিন্তু শনিবার পানির উপরিভাগে বেশি বেশি মাছের আবির্ভাব দেখে একদল ইহুদি লোভ সামলাতে পারলো না। তারা দরিয়ার পাশে পুকুর কাটলো এবং শনিবার সেই পুকুরের সাথে দরিয়ার সংযোগ করে দিল। শনিবার পুকুরে মাছ ভরে গেলে তারা সংযোগ মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর সপ্তাহের অন্য দিনগুলোয় অতি উৎসাহে সে মাছগুলো ধরতে লাগলো। এভাবে তারা আল্লাহর আইন অমান্য করার জন্য কৌশল অবলম্বন করলো। একদল তাদের এই শঠতার পথ পরিহার করতে বললো কিন্তু আর একটি দল চুপ থাকলো। আল্লাহ এই নীরব দর্শক ও কৌশলে আইন অমান্যকারী দুটি দলকে চরম শাস্তি দিলেন। এভাবে কৌশলে আল্লাহর আইন অমান্য করে শাস্তি লাভের অসংখ্য ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করাকে কুরআনের ভাষায় 'মকর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের মকর মানে দুষ্টবুদ্ধি, ছল, চাতুরী, ধোকা, প্রতারণা। আর একটি মকরকে কুরআনে ভালো কৌশল হিসাবে বর্ণনা করে একে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকেরীন'-আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলবিদ। (আলে-ইমরান : ৫৪)

আর প্রথম প্রকারের মকর তথা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আইন অমান্য করা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তাদের পূর্ববর্তীরা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ তাদের ইমারতের অর্থাৎ চক্রান্তের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিলেন। ফলে ইমারতের ছাদ তাদের ওপর ধসে পড়লো এবং তাদের প্রতি আযাব এলো এমন দিক থেকে যা ছিল তাদের ধারণার অতীত।' (আন-নহল : ৪৫-৪৭)

'আর হে মুহাম্মদ, স্মরণ করো, কাফেররা যখন তোমাকে বন্দী, হত্যা বা নির্বাসিত করার জন্য মকর তথা চক্রান্ত করে, আর তারা চক্রান্ত করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী।' (আল-আনফাল : ৩০)

'কাজেই দেখো তাদের চক্রান্তের (মকর) পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করেছি। এই তো সীমালংঘন করার কারণে তাদের

ঘরবাড়ি জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।' (আন নমল ৫১ ও ৫২)
এই প্রতারণামূলকভাবে আইন অবমাননাকারীদের ব্যাপারে কুরআনে আর এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, এদেরকে ছেড়ে দাও, এই মিথ্যাচারীদের লাগাম ঢিলে করে দাও। 'ওয়া মাহ্হিলহুম তামহীলা'-কিছুকালের জন্য এদেরকে অবকাশ দাও। দেখো এরা কতদূর যায়। (আল-মুয্যামমিল : ২১)
অর্থাৎ ছলনা ও প্রতারণামূলকভাবে আইন অমান্য করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে সব যুগে ছিল। তবে আজকের যুগে তা প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে। বিশ একুশ শতকের বিশ্বে আজ আইনই সবচেয়ে বড় শক্তি আবার সমস্ত কিছু বেআইনী ও গর্হিত কাজ করার জন্য আইনকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউরো আমেরিকান সভ্যতা এক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিগত কয়েক শো বছর থেকে বিশ্ববাসীকে তারা যিম্মি করে রেখেছে। ছল ও প্রতারণার সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শাসন কায়েম করে ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বকে তারা নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। তারপর জনতার সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজেদের মুঠো ঢিলে করলেও দু'দুটো বিশ্ব যুদ্ধের পর প্রতারণার নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। সমস্ত স্বাধীন জাতিদের কেন্দ্রীয় জাতিসংস্থা (জাতিসংঘ) বানিয়ে সেখানে সারা বিশ্বের নিরাপত্তার দায়িত্ব সমগোত্রীয় হাতে গোনা কয়েকটি জাতির হাতে তুলে দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশকে সাহায্যের নামে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং সমজাতীয় কয়েকটি ব্যাংক ও সংস্থা কায়েম করে সারা দুনিয়ার সবদেশের অর্থভান্ডারের চাবিকাঠি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। প্রচার যন্ত্র ও মিডিয়াকে এত বেশি শক্তিশালী করেছে যে নিজেদের কণ্ঠ ছাড়া আর সব কণ্ঠই সেখানে নিস্তেজ। তারা যার চেহারাকে যেভাবে দেখাতে চায় ঠিক সেভাবেই দেখা যাচ্ছে ও দেখা হচ্ছে। প্রতারণামূলক আইনের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে তারা নিজেদের প্রভাব বলয়ে আটকে রেখেছে।
সমরাস্ত্র প্রতি যুগে জাতিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই সমরাস্ত্রের সমস্ত চাবিকাঠি তারা নিজেদের কব্জায় রেখে দিয়েছে। বিশ্ব বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমাগুলো কেবল তারাই ব্যবহার করতে পারবে আর কেউ নয়। এজন্য তারা আইনের বেড়াজাল সৃষ্টি করেছে, যাতে এ বেড়াজাল অতিক্রম করে অন্য কেউ এ চাবিকাঠিতে হাত দিতে না পারে। সারা বিশ্বে মানবাধিকার লংঘনের ধূয়া তুলে তারা একচেটিয়াভাবে মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। সততা, নৈতিকতা, ন্যায়, ইনসাফ, মানবাধিকার তাদের একচেটিয়া সম্পত্তি। অন্যদের এর ওপর কোনো অধিকার নেই। তাদের কাছে অনেক প্রাচীন আসমানী কিতাব আছে। সেগুলোর মধ্যে অনেক সত্য কথা আছে। তাদের কাছে অনেক উন্নতমানের দর্শন আছে। অনেক জ্ঞানী লোকের অমূল্য বাণী আছে। যেগুলো জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কিন্তু এসবের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। নিজেদের স্বার্থ ও জাগতিক ক্ষুধা প্রশমন ছাড়া নীতি-নৈতিকতা-ন্যায়-ইনসাফের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। নিজেদের স্বার্থ

উদ্ধারের জন্য মানবতার বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক আইন (মকর) তৈরি করে তারা বিশ্ব মানবতার শান্তি, ধৈর্য ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে। সভ্যতা ও মানবিক সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে আঘাত হানছে।

এই ইউরো আমেরিকান সভ্যতা সারা বিশ্বে যে সংস্কৃতি চর্চার জোয়ার প্রবাহিত করেছে তা হচ্ছে আইনের আশ্রয় নিয়ে যাবতীয় বেআইনী, গর্হিত এবং সভ্যতা ও মানবতা বিধ্বংসী কাজ করতে হবে। এর সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে সন্ত্রাসের প্রতারণা জাল (মকর) বিছিয়ে এই সভ্যতার ধ্বজাধারী দেশগুলোর আফগানিস্তান, ইরাক ও পাকিস্তানের মুসলমানদের নিধনযজ্ঞ পরিচালনা। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ-২০০১ এর নাইন ইলেভেনের পর আফগানিস্তান আক্রমণের প্রাক্কালে বলেছিলেন, এই সবে শুরু, এখন আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে বহু বছর। তখন দুনিয়ার মানুষ তার এ কথার তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু আজ আট বছরের অর্থহীন ও নিষ্ফল যুদ্ধের পর মানুষ যথার্থই অনুধাবন করছে মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও মানবিকতাকে ধ্বংস করে একটা দানবীয় সভ্যতার কাঠামো তৈরি করা ছাড়া এ যুদ্ধের দ্বিতীয় কোনো লক্ষ নেই। ইউরো আমেরিকান সভ্যতা আইনের নামে বেআইনী কাজ করে এবং আইনের আশ্রয় নিয়ে আইনের অবমাননা করে সমগ্র বিশ্বমানবতা ও মানবিক সভ্যতাকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। অথচ আইনই মানুষের জীবন। আইনের প্রতি মর্যাদা প্রদানের ভিত্তিতে মানুষের সভ্যতা জীবনীশক্তি লাভ করে। কাজেই সেই অমোঘ বিধান কার্যকর হবার সময় আবার এসে যাচ্ছে যাতে বলা হয়েছে, 'ওয়া লাও লা দাফ্উল্লাহিন্নাসা বা'দাহুম বিবা'দিন লাফাসাদাতিল আরদ্, ওয়া লাকিন্নাল্লাহা যু-ফাদলিন আলাল আলামীন'

'আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু মহান আল্লাহ জগতবাসীদের প্রতি অপার করুণাশীল। (আল-বাকারা : ২৫২)

ছশো কোটি বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহর করুণাধারা এখনো নিশেষ ও নিস্তব্ধ হয়ে যায়নি। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলবিদ।

– **আবদুল মান্নান তালিব**

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ৯-১৬

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ঃ বাংলাদেশের দণ্ডবিধি ও ইসলামী শরীয়তের বিধান

মুহাম্মদ মূসা

নিজ সম্পত্তি ও দেহ অপর ব্যক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার অধিকার সকল স্বাধীন ও সভ্য সমাজে সর্বজন স্বীকৃত। তবে প্রয়োগের বেলায় এই অধিকার অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। এর প্রয়োগ বা ব্যবহারের সময় দু'টি সীমার দিকে লক্ষ রাখতে হয় ঃ

(ক) যখন কোন ব্যক্তি তার দেহের দিক দিয়ে বা সম্পত্তির দিক দিয়ে অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয় তখন সে তা প্রতিরোধ না করে কাপুরুষের মতো পলায়ন করবে তা আইনের নির্দেশ নয়। আঘাত বা আক্রমণ বা উদ্বেগজনক আস্ফালনের সম্মুখীন হলেই প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার অধিকার জন্মে।

(খ) প্রতিরক্ষার অধিকার বলতে অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান বুঝায় না, বরং যে ব্যক্তি অন্যায় করেছে তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার ও দায়িত্ব রাষ্ট্রের, ব্যক্তির নয়।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ধারা-৯৬ থেকে ধারা-১০৬-এ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। ইসলামী আইনের আওতায় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিধানের সাথে উপরোক্ত বিধানসমূহ সাম স্যপূর্ণ। যেহেতু উভয় স্থানের বিধান একান্তভাবে পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই অত্র নিবন্ধে বাংলাদেশের কার্যকর দণ্ডবিধির বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আগ্রহী পাঠকগণ আইনের পুস্তকসমূহে ৯৬-১০৬ ধারা পাঠ করে নিতে পারেন। উক্ত আইনের ধারা-৯৬-এ বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোনো কিছুই অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। ধারা-৯৭-এ বলা হয়েছে যে, ধারা-৯৯-এ বিধৃত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির-প্রথমত মানবদেহে আঘাতকারী যে কোনো অপরাধের বিরুদ্ধে তার নিজ দেহের এবং অন্য যে কোনো ব্যক্তির দেহের নিরাপত্তার/প্রতিরক্ষার অধিকার থাকবে;

দ্বিতীয়ত চুরি, দস্যুতা, অনিষ্ট বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞাধীন অপরাধ বা চুরি, দস্যুতা, অনিষ্ট বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের উদ্যোগের বিরুদ্ধে নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি প্রতিরক্ষার অধিকার থাকবে।

ধারা-৯৮-এ বলা হয়েছে যে, যখন কোন কাজ যা প্রকারান্তরে একটি বিশেষ অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো তা উক্ত কাজ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির তারুণ্য, অপরিণত বিবেক, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা বা উন্মাদনার কারণে অনুরূপ অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির কাজটি অনুরূপ অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত কাজের বিরুদ্ধে যেরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকতো সেরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকবে।

ধারা-৯৯-এ যে সকল কাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নেই সেই সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত

হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীগণ পদাধিকার বলে বা নির্দেশিত হয়ে যেসব কাজ করেন বা কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকবে না। এই ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারীকে চিনতে না পারে বা তিনি যে সরকারী কর্মচারী তদ্রূপ বিশ্বাস করার কোনো কারণ বিদ্যমান না থাকলে সেই অবস্থায় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার বহাল থাকবে। (বাকী) ধারাগুলে উল্লেখ করা হলো না)।[১]

ইসলামী আইনে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা

মানুষ আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক।[২] তার দেহ ও জীবন অমূল্য, পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ। তাই তার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান অপরিহার্য। মানব জীবন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যায়ভাবে এক ব্যক্তির জীবননাশ যেন সমগ্র মানবজাতির জীবননাশ তুল্য। একইভাবে এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা যেন গোটা মানব জাতির জীবন রক্ষার সমতুল্য।[৩] অতএব জীবন ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, ইজ্জত আব্রুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। এটা কেবল অধিকারই নয়, বরং কর্তব্য এবং ক্ষেত্রভেদে বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ.

'সুতরাং যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করলে তার উপর তোমরা ও অনুরূপ আক্রমণ করো।'[৪]

আইনের ভাষায় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা বলতে-'কোন ব্যক্তির নিজের অথবা অপরের দেহ, জীবন, মাল ও ইজ্জতের উপর আক্রমণের মোকাবিলায় যুক্তি সংগত শক্তি প্রয়োগকে বুঝায়।' এর আরবী পরিভাষা হলো دَفْعُ الصَّائِلِ (আক্রমণ-কারীকে প্রতিহতকরণ), আক্রমণকারীকে صَائِلٌ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে مَصُوْلٌ عَلَيْهِ বলে।

ইজ্জত ও মানবদেহের বিরুদ্ধে আক্রমণ

ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণ প্রতিহত করা ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী অপরিহার্য কর্তব্য। ইমাম আবু হানীফা র.-এর প্রসিদ্ধ মত এবং ইমাম মালেক ও শাফিঈ র.-এর অগ্রগণ্য মত অনুসারে মানবদেহের উপর আক্রমণ প্রতিহত করাও অপরিহার্য কর্তব্য।[৫]

ইমাম আহমাদ র.-এর মতে মানবদেহের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করা বৈধ, কিন্তু অপরিহার্য কর্তব্য নয়। এই মতের সমর্থনে ইমাম মালেক ও শাফিঈ র.-এর একটি পরোক্ষ মতও আছে।[৬] কতক হাম্বলী ফকীহ অরাজকতা ও বিশৃংখলা বিরাজমান থাকাকালে আক্রমণ প্রতিহত করাকে বৈধ এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অপরিহার্য বলেছেন।[৭] কতক শাফিঈ ও মালেকী ফকীহও এই মত পোষণ করেন।[৮]

মালের উপর আক্রমণ প্রতিহত করা

ফকীহগণের অধিকাংশের মতে মালের উপর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অপরিহার্য নয়। জীবন ও ইজ্জত এবং মালের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে এরূপ পার্থক্যের কারণ হলো- কোন ব্যক্তি নিজ জীবনসংহার, দেহের ক্ষতিসাধন ও ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য অপর ব্যক্তিকে অধিকার, অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করতে পারে না। ইসলামী আইনে তা মোটেও বৈধ নয়, অনুমতি

প্রদানকারীর জন্যও নয় এবং অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যও নয়। এমনকি আত্মহত্যা করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।'[৯]

রসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'কোন ব্যক্তি যে অস্ত্র বা উপকরণ দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সে (জাহান্নামে) উক্ত অস্ত্র বা উপকরণ দ্বারা অবিরত করতে থাকবে।'[১০]

অপরদিকে মালের মালিক ইচ্ছা করলে অবৈধ দখলদারের অনুকূলে তার মালিকানা স্বত্বত্যাগ করতে পারে এবং এই অবস্থায় উক্ত মালের ভোগ ব্যবহার দখলদারের জন্য বৈধ হয়ে যায়।[১১]

মানবদেহের উপর আক্রমণ যদি–(১) এমন প্রকৃতির হয় যে, তার দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি নিহত হওয়ার আশঙ্কা করে ঃ (২) এমন আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে, আক্রান্ত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে থাকে যে, সে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবে; (৩) যেনার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে; (৪) মানুষ অপহরণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে–তাহলে সেই ক্ষেত্রে আক্রমণকারীকে হত্যা করা বৈধ।

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য কোনো পন্থায় আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম না হলে প্রতিরোধের মাধ্যমে আক্রমণকারীকে হত্যা করতে পারে। মহানবী স. বলেন ঃ

'তোমার আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করো।' قَاتِلْ دُوْنَ نَفْسِكَ.

ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণ প্রতিহত করা এমন একটি অপরিহার্য কর্তব্য যে বিষয়ে ফকীহগণ সম্পূর্ণ একমত। হযরত উমর ফারুক রা.-র খেলাফত কালে এক পাষণ্ড এক মহিলাকে অপরাধমূলক আক্রমণ করলে উক্ত মহিলা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করে। উমর রা. রায় দেন যে, নিহত ব্যক্তির জীবনের কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ এই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তি হবে না।[১২]

অপহরণকারীকে প্রতিরোধ

মানুষ অপহরণকারীকে ভিন্নতর কোনো পন্থায় পরাস্ত করা সম্ভব না হলে তাকেও আক্রমণ করে হত্যা করা বৈধ। কারণ এই বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জীবনের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে অপহরণ সম্পর্কে স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে–

ধারা-৩৬২ ঃ যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে কোনো স্থান থেকে যাওয়ার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করে অথবা কোনো প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপরহরণ করেছে বলে গণ্য হবে।ঃ

ধারা-৩৬৩ ঃ যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশ থেকে অথবা আইনানুগ অভিভাবকত্ব থেকে অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে–দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

ইসলামী আইনের সাথে ধারা দু'টির বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপহরণ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে।

অপর ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের হেফাজত

যদি আমার বা আপনার উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয় এবং তার একার পক্ষে

আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা সম্ভব না হয় তাহলে সেই অবস্থায় আপনারও আমার করণীয় কি–এ বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবী স.-এর নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ الْمُؤْ مِنِيْنَ يَتَعَا وَنُوْنَ عَلَى الْفِتَنِ.

'ঈমানদারগণ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে।'[১৩]

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো– সে জালেম বা মজলুম যাই হোক।'[১৪]

সাহাবায়ে কিরাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মজলুমকে সাহায্য করবো তাতো ঠিক, কিন্তু জালেমকে সাহায্য করবো কেনো? তিনি বলেন, তোমরা তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রেখে সাহায্য করো। (উপরোক্ত হাদীসের পরবর্তী অংশ)।
অনন্তর মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীও এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ

تَعَا وَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْ وَانِ.

'তোমরা সৎকর্মে ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।'[১৫]
উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা একটি সৎকর্ম এবং এই অবস্থায় তাকে সাহায্য না করা অন্যায়, প্রকারান্তরে অন্যায়কারীকে সহযোগিতা করার শামিল।
বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ধারা নং-৯৭-এ আত্মরক্ষার সাথে সাথে অপরের প্রতিরক্ষার জন্যও অবদান রাখার কথা বলা হয়েছে। অতএব তাতে বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি দেখতে পায় যে, কোন পুরুষ বা মহিলা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয়েছে তখন দর্শক ব্যক্তি তাকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে (13 cir L. Jour, 53)। একইভাবে যদি দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি এক মহিলাকে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আঘাত করছে, তখন উক্ত মহিলার স্বামী অথবা যে কোনো ব্যক্তি উক্ত আঘাতকারীকে হত্যা করার অধিকার রাখে [19x3 P.Cr. L.J. 387 (Lah)]।

প্রতিরক্ষায় কৃত কোন কাজ অপরাধ নয়

'ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণকালে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো কাজই অপরাধ নয়। আত্মরক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অবৈধ আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি তার উপস্থিত বিবেচনা ও প্রয়োজনমতো যা কিছু করে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়।
ইয়া'লা ইবনে উমায়্যা রা. বলেন, আমার এক কর্মচারী জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হলে তাদের একজন অপরজনের হাতের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। যার আঙ্গুল কামড়ে ধরে রাখা ছিল সে সজোরে তার আঙ্গুল টান দিলে অপর ব্যক্তির সামনের পাটির দু'টি দাঁত উপড়ে পড়ে যায়। সে মহানবী স.-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হলে তিনি তার মোকদ্দমা খারিজ করে দেন এবং বলেন, সে তোমার মুখের মধ্যে তার হাত ঢুকিয়ে রাখবে আর তুমি তা উটের মতো চিবাতে থাকবে নাকি![১৬]

দণ্ডবিধির ৯৬ নং ধারার বক্তব্য উপরোক্ত আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনধিকার প্রবেশ

'যেকোনো ব্যক্তির বাড়িতে অপর ব্যক্তির অনধিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং বাড়ির বাসিন্দাদের বাধাদান সত্ত্বেও অনধিকার প্রবেশকারী নিবৃত্ত না হলে তারা প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করে তাকে প্রতিহত করবে।' কোনো ব্যক্তির অন্দর বাড়িতে অপর কারো প্রবেশের প্রয়োজন হলে প্রথমে বাড়ির বাসিন্দাদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا. ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ. وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের বসতবাড়ি ব্যতীত অপর কারো বসতবাড়িতে বাসিন্দাদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা বসতবাড়িতে কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করো না-যাবত তোমাদের প্রবেশানুমতি দেয়া না হয়। যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।'[১৭]

উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, অপরের বসতবাড়িতে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে বাড়ির লোকজনের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না পেলে ফিরে আসতে হবে, জোরপূর্বক প্রবেশ করা যাবে না। অতএব কোন ব্যক্তি কারো বসতবাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করলে বাড়ির লোকজন প্রয়োজনীয় শক্তি দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করবে। এমনকি প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র প্রতিরোধ করা যাবে। তাতে অনুপ্রবেশকারী আহত বা নিহত হলে বাড়ির লোকজন দায়ী হবে না।

বিনা অনুমতিতে অপরের বসতবাড়িতে প্রবেশ তো দূরের কথা, এমনকি ঘরের দরজা-জানালা বা ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি মারাও নিষেধ। বারণ করা সত্ত্বেও উঁকি মারা থেকে বিরত না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে দৈহিক ক্ষতিসাধন করা যাবে না। অপরের ভেতর বাড়িতে উঁকি মারতে রসূলুল্লাহ স. কঠোরভাবে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لَوْ اَنَّ امْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

'কোন ব্যক্তি অনুমতি না নিয়ে তোমার ঘরের অভ্যন্তর ভাগে উঁকিঝুঁকি মারলে এবং তুমি পাথর কণা নিক্ষেপ করে তার চোখ নষ্ট করে দিলে তোমার কোনো অপরাধ হবে না।'[১৮]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হানাফী মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. সতর্ক ও সাবধান করার জন্য উপরোক্ত কথা বলেছেন, মূলত চোখ নষ্ট করে দেয়ার জন্য নয় এবং তা জায়েযও

নয়।[১৯] তবে ঘরের দরজা-জানালা খোলা থাকলে এবং তাতে পর্দা টানানো না থাকলে সেই অবস্থায় কারো উঁকি মারার জন্য তাকে দোষারোপ করা যাবে না।

অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ

'চুরি, দস্যুতা বা অনুরূপ অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা প্রবেশের উদ্যোগ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরক্ষা গ্রহণের অধিকার সর্বস্বীকৃত।' চুরির সর্বোচ্চ শাস্তি হস্তকর্তন এবং ডাকাতি বা দস্যুতার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অতএব চোর, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর অপরাধমূলক অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির আক্রমণে অপরাধী নিহত হলে তার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তি দায়ী হবে না। এমনকি চোর-ডাকাত আক্রান্ত ব্যক্তির মালসহ পলায়নকালে তাদেরকে হত্যা করা ব্যতীত তা উদ্ধার করা সম্ভব না হলে হত্যাকান্ড ঘটানোও বৈধ। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَشَهِيْدٌ

'কোনো ব্যক্তির মাল অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া হলে এবং সে তা প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে।[২০]

তবে চোর-ডাকাত মাল ত্যাগ করে পলায়ন করলে এই অবস্থায় তার পিছু ধাওয়া করে তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। তাকে গ্রেফতার করে আইনানুগ কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করতে হবে। দণ্ডবিধির ৯৭ নং ধারায় এ সম্পর্কিত বাংলাদেশের আইন বিদ্যমান, যা শরীয়া আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নাবালেগ ও পাগলের আক্রমণ

'কোনো ব্যক্তি নাবালেগ বা পাগলের সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হলে সে তার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।' ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ শায়বানী র.-এর মতে প্রয়োজনবোধে আক্রান্ত ব্যক্তি পাগল বা নাবালেগকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু এ জন্য তাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) দিতে হবে, যদিও উক্ত কর্ম হদ্দের আওতাভুক্ত নয়।[২১] পক্ষান্তরে ইমাম মালেক, শাফিঈ আহমাদ ও আবু ইউসুফ র.-এর মতে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে না। কারণ সে নিজ জান-মালের হেফাজতের জন্যই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[২২]

উপরোক্ত দুই বিপরীত অভিমতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত দলের মতে আক্রমণ কর্মটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ কর্ম হতে হবে এবং একই সঙ্গে অপরাধীকেও আইনের আওতায় আনয়ন সম্ভবপর হতে হবে। এক্ষেত্রে আক্রমণটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও আক্রমণকারী আইনের আওতাভুক্ত নয় (নাবালেগ, পাগল ও পশুর আক্রমণ অপরাধ নয়)। আক্রান্ত ব্যক্তি যা করে তা 'প্রতিরক্ষামূলক' পদক্ষেপ নয়, বরং 'জরুরি প্রয়োজনে গৃহীত পদক্ষেপ' মাত্র। শেষোক্ত দলের মতে, এক্ষেত্রে 'আক্রমণটি 'শাস্তিযোগ্য অপরাধকর্ম' হওয়া জরুরি নয়, 'আইন বিরুদ্ধ কর্ম' হওয়াই যথেষ্ট এবং আক্রমণকারীরও আইনের আওতায় আনয়নযোগ্য হওয়াও জরুরি নয়। সেজন্য নাবালেগ ও পাগলের আক্রমণের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ 'প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ' হিসেবেই গণ্য, 'জরুরি পদক্ষেপ নয়'। তাই আক্রান্ত ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য হতে পারে না।[২৩] দণ্ডবিধির ৯৮ নং ধারায় এ সম্পর্কিত বাংলাদেশের আইন উক্ত হয়েছে এবং তা শরীয়া আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আক্রমণকারীর প্রতিআক্রমণ

'আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রতিহত হয়ে আক্রমণকারী পুনরায় যে আক্রমণ করে তা তার বেলায় প্রতিরক্ষা হিসেবে গণ্য হবে না।' এ বিষয়ে হযরত আলী রা.-র একটি রায় প্রণিধানযোগ্য। এক নারী তার বাসর রাতে তার প্রেমিক প্রবরকে তার শয়নকক্ষে লুকিয়ে রাখে। তার স্বামী তাকে হত্যা করার পর স্ত্রী স্বামীকে আক্রমণ করে হত্যা করে। হযরত আলী রা. স্বামীকে হত্যার অপরাধে স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। তিনি স্ত্রীর আক্রমণকে তার নিজের জন্য 'প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা' হিসেবে গণ্য করেননি।[২৪]

আক্রান্ত ব্যক্তির ভুল কর্ম

'আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা কালে আক্রান্ত ব্যক্তি ভুলে বা অসাবধানতাবশত ভিন্ন ব্যক্তিকে আহত বা হত্যা করলে ক্ষতির প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থদণ্ড (দিয়াত) বা ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যকর হবে'।[২৫] ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার মূলনীতি হলো, 'প্রতিরক্ষাকল্পে কৃতকর্ম বৈধ এবং শাস্তিযোগ্য নয়।'[২৬]

আক্রান্ত ব্যক্তির পলায়ন

'আক্রমণকারীর হামলা থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করা সম্ভব এবং সঙ্গত হলে আক্রান্ত ব্যক্তি তাই করবে'। ফকীহগণের মধ্যে যাঁরা 'পলায়ন'কে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে গণ্য করেন তাদের মতে সম্ভব হলে বা সুযোগ থাকলে আক্রান্ত ব্যক্তির পলায়ন করাই উচিত। কারণ পলায়ন প্রতিরক্ষার একটি উত্তম উপায় এবং প্রতিরক্ষার জন্য সহজতর ও সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করাই আক্রান্ত ব্যক্তির কর্তব্য।[২৭] অপর দলের মতে 'পলায়ন' প্রতিরক্ষার উপায় নয়। তাদের মতে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্ভাব্য উপায়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে, এটাই তার কর্তব্য।[২৮]

যে ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার অধিকার নেই

'কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কাজটি সম্পাদন করা আইনত বাধ্যতামূলক অথবা সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, সেই কাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ সম্পাদন করলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে গণ্য হবে না, যদিও তা অপর পক্ষের নিকট আক্রমণ বলে প্রতিপন্ন হয়।' অর্থাৎ আইন যে কাজটি সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক করেছে অথবা করার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করেছে-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সেই কাজটি আইন লঙ্ঘন বা আক্রমণ হিসেবে গণ্য নয়। যেমন সরকারের নির্দেশে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান, তাকে গ্রেফতার বা আটক করা আইন লঙ্ঘন বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আক্রমণ নয়। একইভাবে দণ্ডিত ব্যক্তির উপর আদালতের নির্দেশে দণ্ড কার্যকর করাও আক্রমণ নয়, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হিসেবে গণ্য।[২৯] দণ্ডবিধির ৯৯ নং ধারা উপরোক্ত ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশিকা

১. ধারাসমূহ ও এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দ্র. গাজী শামছুর রহমান, দণ্ডবিধির ভাষ্য, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৭ খৃ., পৃ. ১২১-১৪৩।

২. দ্র. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ৭০।

৩. দ্র. সূরা আল-মাইদা, আয়াত নং ৩২।

৪. সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৯৪।

৫. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ৫খ., পৃ. ৪৮১; তুহ্ফাতুল মুহ্তাজ, ৪খ., পৃ. ১২৪, মাওয়াহিবুল জালীল, ৬খ., পৃ. ৩২৩; আয-যায়লাঈ ও হাশিয়া আশ-শিবলী, ৬খ., পৃ.-১১০।

৬. আল-মুগনী, ১০খ., পৃ. ৩৫০-৫১।

৭. আল-ইকনা, ৪খ., পৃ. ২৯০।

৮. হাশিয়াতুর-রামলী, ৪খ., পৃ. ১৬৮; আসনাল মাতালিব, ৪খ., পৃ. ১৬৮।

৯. সূরা আন-নিসা, আয়াত নং ২৯।

১০. সুনান আবু দাউদ।

১১. আত-তাশরীঈল জানাইল ইসলামী, ১খ., ধারা-২৩৩।

১২. আত-তাশরীঈল জানাইল ইসলামী, ১খ., পৃ. ১৯৭ (ইং অনু.)।

১৩. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারাত, বাব ৩৬, নং ৩০৭০।

১৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাজালিম, বাব ৪; কিতাবুল ইকরাহ, বাব ৭; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিরর, হাদীস নং ৬৩; জামে' আত-তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, বাব ৬৭।

১৫. সূরা আল-মাইদা, আয়াত নং ২।

১৬. সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, বাব ১৮, নং ৬৮৯২; মুসলিম, কিতাবুল কাসামা, নং ৪৩৬৬/১৮; আবু দাউদ, কিতাবুদ-দিয়াত, বাব ২২, নং ৪৫৮৪-৫, তিরমিযী, আবওয়াবুদ-দিয়াত, বাব ১৯, নং ১৪১৬; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ২০, নং ২৬৫৬ নাসাঈ, কিতাবুল কাসামা, বাব ১৮, নং ৪৭৬২।

১৭. সূরা নূর, আয়াত নং ২৭-২৮।

১৮. সুনান আবু দাউদ, বাব ১২৭; জামে' তিরমিযী, ইসতি'খান, বাব ১৭; সুনান নাসাঈ, কিতাবুল কাসামা, বাব ৪৭। অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত আরেকটি হাদীসের জন্য দ্র. তিরমিযী, ইসতি'খান, বাব ১৭; বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থ ও দ্র.।

১৯. বিস্তারিত দ্র. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ৫খ., পৃ. ৪৮৫; মাওয়াহিবুল জালীল, ৬খ., পৃ. ৩২২-২৩।

২০. অনুরূপ হাদীসের জন্য দ্র. মুসনাদ আহমাদ, ২খ., পৃ. ২০৬, নং ৬৯২২ সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাজালিম, বাব ৩৩, নং ২৪৮০, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আয়মান, নং ২২৬; জামে' আত-তিরমিযী, কিতাবুদ দিয়াত। বাব ২১; সুনান আন-নাসাঈ, কিতাবু তাহরীমিদ-দাম, বাব ২২-২৩; সুনান ইবনে মাজা, হুদূদ, বাব ২১। আরো দ্র. আল-হিদায়া, ৪খ., পৃ. ৫৫২; শারহু ফাতহিল কাদীর, ৯খ., পৃ. ১৬৭।

২১. আত-তাশরীঈল জানাইল ইসলামী, ১খ., পৃ. ৪৭৬, আল-বাহরুর রাইক, ৮খ., পৃ. ৩০২।

২২. মাওয়াহিবুল জালীল, ৬খ., পৃ. ৩২৩; তাবসিরাতুল হুক্কাম, ২খ., পৃ. ৩০৩; কিতাবুল উম্ম, ৬খ., পৃ. ১৭২; আল-মুহাযযাব, ২খ., পৃ. ২৪৩; আল-ইকনা, ৪খ., পৃ. ২৮৯।

২৩. আত-তাশরীঈল জানাইল ইসলামী, ১খ., পৃ. ৪৮০।

২৪. উপরোক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড., পৃ. ৪৮০।

২৫. উপরোক্ত ৫ গ্রন্থ, ১খ., পৃ. ৪৮০।

২৬. উপরোক্ত বরাত।

২৭. আল-মুগনী, ১০ খ., পৃ. ৫৩৫।

২৮. আল- মুগনী, ১০ খ., পৃ. ৩৫৩; কিতাবুল উম্ম, ৬খ., পৃ. ২৮।

২৯. আত-তাশরীঈল জানাইল ইসলামী, ১খ., পৃ. ৪৭৯, ধারা ৩৩৫।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ১৭-৩২

ইসলামী ফিকহের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি

মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতির বিবেচনায় ইসলামী ফিকহের চারটি যুগ চিহ্নিত করা যায় :

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন কাল; তথা ১০ম হিজরী পর্যন্ত ফিক্‌হের প্রথম যুগ।
২. সাহাবা রা.-এর আমল তথা ৪১ হিজরী পর্যন্ত ফিক্‌হের দ্বিতীয় যুগ।
৩. বয়োকনিষ্ঠ সাহাবা রা. ও তাবেঈ রা. গণের আমল তথা, হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত তৃতীয় যুগ।
৪. দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত চতুর্থ যুগ।

প্রথম যুগ

জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে ফিক্‌হ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আইন প্রণয়ন বিচার-ফয়সালা ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। তাঁর প্রদত্ত ফয়সালা আইন কানূনগুলো আলোচিত এবং অবশ্যই অনুসৃত হত কিন্তু যথারীতি সংকলিত হয়নি। তৎকালীন জীবন যাত্রার প্রয়োজন সীমিত হবার কারণে এর তেমন প্রয়োজনও ছিল না।

রসূলুল্লাহ স. এর আমল ছিল মানব জীবনের মৌল শক্তি ও গুণাবলীকে বিকশিত করার এবং ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যুগ। এজন্য শরীয়তের শিক্ষা দান, গ্রহন ও বাস্ত বায়নের প্রতিই ছিল সবার দৃষ্টি। তদুপরি তাদের উপর ন্যস্ত ছিল কঠোর জিহাদের দায়িত্ব- সংযমের জিহাদ, প্রচারের জিহাদ, আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র জিহাদ। অপরদিকে তখন লেখাপড়ার চর্চাও ছিল সীমিত। সাহাবীগণ রা. কুরআন শরীফের আয়াতের অনুলিপি রাখতেন। হাদীস লিখতে খোদ রসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছিলেন। একটি সৎ, সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ জীবনের যে সব সমস্যা ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হতে পারে সেগুলোর

লেখক : পাকিস্তানের খ্যাতিমান গবেষক আলেম। ওআইসির কেন্দ্রীয় ফিকহ একাডেমীর সদস্য।

বিশ্লেষণের মধ্যেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাহাবাগণের রা. দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই শিক্ষা বাস্তবায়নের মধ্যে। সাধারণত এশিক্ষাগুলো ছিল শাসনতান্ত্রিক ধাঁচের। এগুলোর ভিত্তিতে আইনের ইমারত তৈরী করা হয়। অনেকগুলো খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল বহুলাংশে অবস্থা ও যামানার চাহিদার ভিত্তিতে। কখনো রসূলুল্লাহ স. নতুন আইন প্রবর্তন করেছিলেন। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনগুলোর মধ্যে মামুলি ধরনের পরিবর্তন ও সংশোধন করে গ্রহন করে নিয়ে ছিলেন।

ফিক্‌হের উৎস

রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে ফিক্‌হের মাত্র দুটি উৎস ছিল ঃ

১. কুরআন হাকীম

২. রসূলের ব্যাখ্যা

কুরআনে মূলনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিধান ছাড়া একটি সৎ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সমস্যাবলীও আলোচিত হয়েছে। যখন যেমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেই অনুযায়ী কুরআনী বিধানও নাযিল হয়েছে। এই সঙ্গে বিপদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যও বিধান এসেছে। যখন যেমন ওহী নাযিল হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন-খুব বেশী জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন তখন দেখা দেয়নি।

রসূলের বাচনিক ব্যাখ্যা প্রদানের মধ্যেও এই ধারাই প্রবল ছিল। অর্থাৎ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অথবা বিভ্রান্তি এড়াবার তাগিদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে বর্ণিত বিধানের বাচনিক ব্যাখ্যা দিতেন এবং প্রয়োজনে স্থান ও কাল নির্ধারিত করে দিতেন। রসূলুল্লাহ স. এর কর্মের পরিধি এত ব্যাপক এবং আল্লাহর হিকমতের সামঞ্জস্যশীল ছিল যে তার কর্মাদর্শ সব রকম প্রয়োজন পূর্ণ করতো। এজন্য বাচনিক ব্যাখার তেমন বেশী প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণের কাজের বিবরণ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা দেয়া।

২. আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা দান। হিকমত শিক্ষা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. উম্মতের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। এজন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল না। প্রদত্ত বিধিবিধান কার্যকর করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হতো। রসূলুল্লাহর স. সাহচর্য এতই প্রভাবশীল ছিল যে তাঁর অনুকরণে সমাজ জীবনের কাঠামোই পুরোপুরি বদলে যেতো।

৪. সমষ্টিগত জীবনের এমন প্রশিক্ষণ দান করা যাতে জীবন পথের প্রতিটি মোড় প্রতিটি অবস্থান অতিক্রম করে ইসলামী কার্যক্রম অনবরত এগিয়ে যাতে পারে।

৫. এমন একটি জনবল গঠন করা যার ফলে নবূওয়তের অবসানের পর নবূওয়তের দায়িত্ব নবূওয়তেরই নকশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে ঠিক তখনই বিদায় নিলেন যখন ইসলামের বুনিয়াদ সব দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছেন। একদিকে তিনি ইসলামী আইনের ভবিষ্যৎ সংকলনের প্রয়োজন মিঠাবার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ একটি কাঠামো তৈরী করে দেন এবং অন্যদিকে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তীদের জন্য কার্যকর পন্থা সৃষ্টি করে যান।

অন্যপক্ষে সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর কর্ম ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁরা যে কুরআনী তালীম পেতেন তা মুখস্থ করা, বুঝা ও 'আমল করা। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাচনিক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যা সমূহ নিজেদের জীবনে সংযোজিত করতেন। এ ছাড়া আত্মসমৃদ্ধি ও চরিত্র সংশোধন মূলক বিশেষ হেদায়াত সমূহকে তাঁরা মনে প্রাণে অনুধাবন করতেন। তাঁরা নিজেদের জান-মালের বড় বড় কুরবাণী দিয়ে নবীর মিশন ও কার্যক্রমকে অগ্রগামী করতেন।

দ্বিতীয় যুগ

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব

বহু সংখ্যক বিজয় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ধারার মুখোমুখি হবার কারণে এই যুগে নতুন নতুন বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। অবস্থা ও যুগের দাবীর প্রেক্ষিতে সমস্যাবলী সমাধানের নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথম যুগের যে বিধান সমষ্টি মনের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত এবং বাস্তবে কার্যকর ছিল, সমকালীন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদের সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তারা সেই সম্প্রসারণ কর্ম এমনভাবে সম্পন্ন করলেন যাতে অন্য কোন উৎস থেকে আলো ধার করার প্রয়োজন দেখা না দেয়।

ইজমা ও রায়

এ যুগে উদ্ভুত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য দুটি আইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে প্রক্রিয়ার ব্যবহার শুরু হয়। এ দুটি হচ্ছে: (১) ইজমা ও (২) রায়। (যথাক্রমে ফকীহদের সম্মিলিত মত এবং তাঁদের ব্যক্তিগত মত) এ দুটিকে কাজে লাগানোর প্রেরণা কুরআন ও সুন্নায় ছিল। যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর পরবর্তী যুগের লোকেরাই আল্লাহর দীনের হেফাজতকারী ও আমানতদার ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের 'আমল অর্থাৎ কর্মধারা থেকে ফায়দা হাসিল করা নবুওয়তের নকশার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই তাঁরা নিজেদের গুরু দায়িত্ব অনুভব করে ফিক্‌হকে ব্যাপকতর করার পথ উম্মুক্ত করেন। এভাবে তাঁরা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য অনেক সম্পদ জমা করে দেন। এ যুগে ইজ্‌মাকে

সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করা হয়। এজন্য যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সঙ্গে যতদূর সম্ভব যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের বাইরে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়া হয়। কুরআন ও সুন্নায় কোন উদ্ভূত বিষয়ে ফয়সালা না পাওয়া গেলে তাঁদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে যে ফয়সালা গৃহীত হয়ে যেত তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে থাকে। অবশ্য ফকীহ'র রায় প্রদান এবং গ্রহণের ব্যাপারে ফিক্‌হের বিধিবিধান ও মূলনীতি পরবর্তী পর্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়। শরীয়তের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সমূহের আওতাধীনেই রায় অর্থাৎ সুযোগ্য ফকীহদের সুচিন্তিত ও ইজতিহাদ প্রসূত অভিমতের ব্যবহার হতো। কিন্তু যে বে-পরোয়া ব্যক্তিগত মত বা রায় ইসলামের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতির ওপর আঘাত হানতো তা প্রত্যাখ্যাত এবং তার তীব্র বিরোধিতা করা হতো।

কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আইনের উৎস রূপে ইজমা যুক্ত হলেও এই যুগের ফিকহের উপজীব্য ছিল বাস্তবতা নির্ভর ও ঘটনা ভিত্তিক। যখন যে প্রয়োজন দেখা দিতো অথবা যে সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানের দাবী করতো কেবলমাত্র তারই সমাধান পেশ করা হতো। পরবর্তীকালে যেসব সমস্যা ও ঘটনার উদ্ভব হতে পারে সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মত ফুরসত তাঁদের ছিল না। বিভিন্ন প্রকার ফায়দার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী প্রয়োজনসমূহ এতবেশী ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল যে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই যুগের কিছু কিছু বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। এর কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধের কারণ

কতিপয় ব্যাপারে এ যুগে সাহাবায়ে কেরামের রা. মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ১. কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ হওয়ার কারণে বিধান দানেও মত পার্থক্য ঘটে। কয়েকটি অবস্থায় কুরআনের ব্যাখ্যায় মত পার্থক্য দেখা দিতো ঃ (ক) দ্ব্যর্থবোধক আরবী শব্দের ব্যবহার যেমন- (তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের 'ইদ্দত সম্পর্কে ব্যবহৃত 'কুরু' শব্দটিকে কোনো কোনো সাহাবী হায়েজ অর্থে ব্যবহার করেছেন আবার অন্যেরা পরিচ্ছন্ন (তুহর) অবস্থার অর্থে ব্যবহার করেছেন।

(খ) আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের প্রয়োগ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত যে আয়াতে চার মাস দশদিন বলা হয়েছে, সে আয়াতটির অর্থ ব্যাপক, ফলে গর্ভবতী নারীর স্বামীর মৃত্যুতেও ইদ্দতের একই বিধান বলে অনুমিত হয়। কিন্তু তালাক প্রাপ্তা গর্ভবতী নারী সম্পর্কিত আয়াতে সন্তান প্রসব কাল পর্যন্ত তার ইদ্দত নির্দেশ করা হয়েছে। গর্ভবতী নারীর স্বামী মারা গেলে সে কোন আয়াতের আওতাধীন হবে? তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন হবে? না সন্তান প্রসব কাল পর্যন্ত ? কোনো কোনো সাহাবী প্রথম আয়াত অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন; কেউ দিয়েছেন দ্বিতীয়

আয়াত অনুযায়ী। (গ) স্থান ও কাল নির্ধারনের ব্যাপারে মতবিরোধ। অন্য সাহাবীদের সাথে হযরত উমর র.-এর অধিকাংশ মতবিরোধ এ কারণেই হয়েছে।

২. কোন হাদীস সম্পর্কে কোন সাহাবীর অনবহিত থাকার কারণে ফতোয়ার বিভিন্নতা। সাধারণভাবে হাদীস হযরত স. এর সাহাবীদের জানা কিম্বা এ সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল লোকদের সামনে ছিল। আবার কতিপয় হাদীস সম্বন্ধে বহু সাহাবী অনবহিত ছিলেন এবং এ সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ স.-এর আমলও ছিল অল্প কয়েকজন সাহাবীর জ্ঞাত, অন্যেরা ছিলেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা করার রেওয়াজ তখন ছিল না, গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধও ছিল না।

৩. কোন হাদীস যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সে সূত্রটি নির্ভরযোগ্য কিনা, এ ব্যাপারে মত পার্থক্যের কারণে ফতোয়ার মধ্যেও বিরোধ দেখা দেয়।

৪. 'রায়' দানের ব্যাপারে মত বিরোধ। সাহাবীগণ 'রায়' প্রদান করার ক্ষেত্রে মাসালিহ (জনকল্যাণ) দীনের মূলনীতি ও ফিক্হের প্রাণ তথা হিকমত-এ সবই দৃষ্টিপথে রেখেছিলেন। তাঁদের আমলে ফিকহের নিয়ম কানূন রচিত বা বিধিবদ্ধ হয়নি, বিধান দানের ব্যাপারে 'ইসতিহসান' (যুক্তিগ্রাহ্য হলেও জনকল্যাণের বিবেচনা) এবং 'ইসতিসলাহ' (অবস্থা দৃষ্টে কল্যাণকামিতা) এর নীতি গ্রহণের প্রমাণ সাহাবীদের আমলেও পাওয়া যায়। যদিও তাঁরা শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের স্থান কাল নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং নবুওয়তের প্রকৃতির সাথে পরিচিতির মাধ্যমে শরীয়ত ব্যবস্থাকে হৃদয়ংগম করেছিলেন। তবুও সকল সাহাবা একই দৃষ্টিকোণ থেকে মাসলিহাত তথা সার্বিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেবেন এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা দিত। ফলে ফতোয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা সৃষ্টি হত।

তবে যেহেতু এই আমলে ফিকহ ছিল ঘটনাভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী তাই মতবিরোধ ছিল সীমাবদ্ধ। অন্যপক্ষে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিশ্চিয়তা অর্জন করার পর যে সমস্যার সমাধান করা হতো তার মধ্যে মত বিরোধের অবকাশই থাকতো না।

এই যুগের সর্বপেক্ষা প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং গভীর তত্ত্ব জ্ঞানীদের নাম নীচে দেয়া হলো ঃ হযরত আবু বকর রা., হযরত উমর রা., হযরত উস্‌মান রা., হযরত আলী রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা., হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা., হযরত উবাই ইবনে কাব রা. এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. প্রমুখ।

মুসলমানদের বিভক্তি

এ যুগে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠী তিন ভাগে বিভক্ত হয় যায়। দলগুলো ফিকহের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ যারা হযরত আমীর মু'আবীয়ার রা.-এর খিলাফত মেনে নিয়েছিল।

(২) শিয়া সম্প্রদায় যাদের বিশ্বাস, রসূলুল্লাহ স.-এর পর হযরত আলী রা. ছিলেন খিলাফতের বৈধ অধিকারী এবং খিলাফত অবশ্যই আহলে বায়ত তথা নবী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

(৩) খারেজী সম্প্রদায় ঃ যারা হযরত উসমান রা., হযরত 'আলী রা. ও হযরত মু'আবীয়া একযোগে এই তিন জনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো।

মতবিরোধ রাজনৈতিক বা যে ধরনেরই হোক না কেন, তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব স্বরূপ স্বপক্ষীয়দের রেওয়ায়েত ও 'রায়' অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকলো, ফলে ফতোয়ায় বিভিন্নতা দেখা দিল।

দলবাজীর সাথে যারা পরিচিত তারা ভালোভাবেই জানেন অধিকাংশ মতপার্থক্য হয় রাজনৈতিক ধরনের। নিছক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দলীয় মতবাদকে তারা ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত হয়। তারা ধর্মকে স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত করে। ফেরকাবাজী ও দলবাজীর এই ইতিহাস অত্যন্ত করুণ ও হৃদয় বিদারক। প্রায় প্রত্যেকটি দলের পশ্চাৎপট রাজনৈতিক এবং প্রতি যুগে রাজনীতির কুরবানগাহে ধর্মকে নযরানা হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় যুগ

ফিক্হের ভিত্তিস্থাপন

এ যুগটি হযরত আমীর মু'আবীয়া রা.-এর শাসনামল ৪১ হিজরী সন থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ফিকহের সংকলন, বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার সমস্ত মালমসলা এ যুগেই তৈরী হয়। এজন্য একে ফিকহের বিন্যাস ও গ্রন্থনার ভিত্তিযুগ বলাই সংগত।

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ফিকহের উপর প্রভাব বিস্তার করে ঃ

১. ফেরকাবাজীর দরুণ প্রত্যেক ফেরকার প্রবণতা হল কোন কোন পর্যায়ে দলীয় লোকদের রেওয়ায়েত ও রায়কে অগ্রাধিকার দান করা।

২. কেন্দ্রের প্রতি আগের মতো আকর্ষণ না থাকার কারণে এবং এই সঙ্গে ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাগিদে 'উলামা ও ফকীহগণ বিভিন্ন বিজিত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের শিক্ষায় তাবেঈদের একটি নতুন প্রজন্ম যোগ্যতার মাফকাঠিতে সাহাবীদের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হয়। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো তাবেঈ যথার্থই বিধান উদ্ভাবন ও ফতোয়া দান ইত্যাদি ব্যাপারে সাহাবীগনের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

৩. হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণ শিক্ষারীতি ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে। সাহাবীদের যুগে এ কাজটি কতকটা সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানগুলো তখন বাস্তব কর্মরূপে মূর্ত

ছিল তাই হাদীস বর্ণনার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন রসূলুল্লাহ স. এর কথা, কাজ ও জীবন ধারা, যা সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে চিত্রায়িত করে রেখেছিলেন, শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে যত ব্যাপকভাবে সম্ভব প্রচলিত করাই ছিল শরীয়ত অপরিবর্তিত রাখার একমাত্র পথ। কাজেই সাহাবীগণ নিজেদের জ্ঞাত সমস্ত হাদীস এবং নিজেদের পবিত্র জীবন ধারা তাবেঈদের হাতে সমর্পণ করেন। রসূলুল্লাহ স. এর অন্তর্ধানের পর তাদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে এবং সমাধান দিতে হয়েছিল, তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুসলিম মিল্লাত যে সব আকীদা এবং অনুষ্ঠানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাহাবায়ে কেরাম রা. সে সবই তাবেঈদের সামনে তুলে ধরেন।

৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আজমী (অনারব) লোকেদের একটি বিরাট দল তৈরী হয়। তাঁরা ইসলামী বিশ্বের সমস্ত শহরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। যোগ্যতার দিক দিয়ে তারা আরবদের চাইতে কম ছিলেন না। বরং কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ফিকহ্ ও হাদীসের ক্ষেত্রে আজমীদের অবদান ছিল আরবদের চাইতে বেশী। যদি বেশী নাও হয়, তবে অবদানের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এভাবে শরীয়তে ব্যবস্থা অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও নতুন আংগিকে চিন্তা করার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় অনারব দেশের লোকদের পক্ষে।

৫. 'রায়' ও হাদীস প্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি দল এমন সব হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দিতো যেগুলো তাদের গোচরীভূত ছিল এবং যেগুলোর সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল। এজন্য তাদের ফতোয়া দানের গণ্ডী ছিল তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় দলটি শরীয়তকে বুদ্ধি ও নীতি ভিত্তিক মানদন্ডে বুঝতে চেষ্টা করতো এবং কোনো ক্ষেত্রে হাদীস না পাওয়া গেলে তারা 'রায়'-এর আশ্রয় গ্রহণ করতো। এজন্য ফতোয়া দানের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টির পরিসর প্রথমোক্ত দলটির তুলনায় ছিল ব্যাপকতর। হিজাযবাসীগণের প্রবণতা ছিল প্রথমোক্ত দলটিকে অগ্রাধিকার দানের দিকে এবং তাদের কেন্দ্র ছিল মদীনা। আর দ্বিতীয় দলটির প্রতি অনুরক্ত ছিল 'ইরাকবাসীরা এবং তাঁদের কেন্দ্র ছিল কুফা। একথা সুস্পষ্ট, হিজাযবাসীদের পক্ষে হাদীসের সন্ধান করা যতটা সহজ ছিল ইরাকবাসীদের ততটা ছিলনা। তবে সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর হিজাযবাসীদের জন্যও হাদীসের সন্ধান ও সংগ্রহ আর ততটা সহজ থাকেনি। সেসময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন ছিলনা যাতে হাদীস ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর ছিল। অন্য দিকে 'রায়' ব্যবহারকারী দলটি 'ইল্লাত' ও কার্যকারণ সন্ধান করে মূলনীতির আওতায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাসায়েল ও বিধি-বিধানকে যুঁথিবদ্ধ করতে পারতো। এছাড়া প্রথম দলটির তুলনায়

দ্বিতীয় দলটি তমদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার অধিকতর বৈচিত্র জনিত অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল অনেক বেশী। এখানে বাইরের প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন তমদ্দুন ও মতবাদের ধারক এখানে বেশী ছিল। একারণে দু'দলের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য হওয়া ছিল অনিবার্য। ফলে তাদের ফতোয়া ও ফয়সালার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল।

কিয়াস ইস্তিহসান ও ইস্তিস্লাহের ব্যাপক ব্যবহার

এ যুগে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াস, ইসতিহসান ও ইসতিসলাহের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে। ফকীহগণের ওপর নতুন নতুন প্রশ্নের চাপ পড়ে। ফলে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলনা। হাদীসপন্থী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। এমনকি তাঁরা কিয়াসকেই নাজায়েয গন্য করেন। কিন্তু তাঁরা যদি কিয়াস পন্থীদের মতো সমপর্যায়ে বাস্তব জীবনের সমস্যাদির মুখোমুখি হতেন তাহলে মতবিরোধের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা দিতো। একারণে মতবিরোধের কঠোরতা বেশী দিন অব্যাহত থাকতে পারেনি। বরং কিছুদিন পরে তাঁদের শাগরিদদের মধ্যে পারস্পরিক 'ইলমের চর্চা ও গবেষণার মাধ্যামে লাভবান হবার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এই যুগের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণের নাম নীচে দেয়া হলো ঃ

মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

(১)উম্মু'ল মু'মেনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা রা. (২) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. (৩) হযরত আবু হুরাইরা রা. (৪) হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব মাখযুমী রা. (৫) হযরত 'উরওয়াহ ইবনে যুবাইর ইবনে 'আওয়াম রা. (৬) হযরত আবু বকর ইবনে 'আবদির রহমান রা. (৭) হযরত আলী ইবনে হোসাইন রা. (৮) হযরত 'উবাইদুল্লাহ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উতব ইবনে মাসউদ রা. (৯) হযরত সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রা. (১) হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা. (১১) হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রা. (১২) হযরত নাফে রা. (১৩) হযরত ইবনে শিহাব যুহরী রা. (১৪) হযরত আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে 'আলী ইবনে হোসাইন রা. (১৫) হযরত আবু যিনাদ 'আবদুল্লাহ্ ইবনে যাকওয়ান রা. (১৬) হযরত য়াহ্য়া ইবনে সাঈদ আনসারী রা. এবং (১৭) হযরত রাবী'আহ্ ইবনে আবী আব্দি'র রহমান রা.।

মক্কা ও কূফার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

মক্কার ফকীহগন হচ্ছেন (১) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রা. (২) হযরত মুজাহিদ ইবনে জুবাইর রা. (৩) হযরত ইকরামা. রা. (৪) হযরত 'আতা ইবনে রিবাহ রা. (৫) হযরত আবু' যুবাইর মুহাম্মদ মুসলিম রা.।

কুফার ফকীহ্ ও মুফতীগণ হচ্ছে ঃ (১) হযরত 'আলকামাহ ইবনে কায়েস আন-নাখঈ রা) (২) হযরত মাসরূক ইবনে আজদা রা., (৩) হযরত 'উবাইদাহ ইবনে উমর সালমানী (র), (৪) হযরত আসওয়াদ ইবনে যায়েদ নাখঈ (৫) হযরত শুরাইহ্ ইবনে হাবেস কিসদী, (৬) হযরত ইবরাহীম ইবনে যায়েদ নাখঈ (৭) হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং (৮) হযরত 'আমের ইবনে শারাহবীল রা.।

বসরা ও সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ও মুফতীগণ

বসরার ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ (১) হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী রা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম (২) হযরত আবুল 'আলীয়া রা. (৩) হযরত আবুশ শা'শা জাবের ইবনে যায়েদ রা. (৪) হযরত হাসান ইবনে আবিল হাসান য়াসার রা) এবং (৬) হযরত কাতাদাহ ইবনে দা'আমাহ রা.।

সিরিয়ার ফকীহ্ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ (১) হযরত 'আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশ'আরী রা. (২) হযরত আবু ইদরীস খাওলানী রা. (৩) হযরত কাবীসা ইবনে যুওয়াইর রা. (৪) হযরত মাকহুল ইবনে আবু মুসলিম রা. (৫) হযরত রজা ইবনে হায়াতিল কিনদী রা. এবং (৬) হয়রত 'উমর ইবনে 'আবদিল 'আযীয ইবনে মারওয়ান রা.।

মিসর ও য়ামেনের বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুফতীগণ

মিসরের ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ (১) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনিল 'আস রা. (২) হযরত আবু খায়র মুরশিদ ইবনে আবদিল্লাহ রা. এবং (৩) হযরত যায়েদ ইবনে আবী হাবীব রা.।

য়ামেনের ফকীহ ও মুফতীগণ হচ্ছেন ঃ (১) হযরত তাউস ইবনে কায়সান জুনদী রা. (২) হযরত ওহাব ইবনে মুনাববিহ রা. এবং (৩) হযরত য়াহয়া ইবনে আবী কাসীর রা.। এ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

উল্লেখিত মনীষীগণ সবাই হাদীসও ফিকহের জ্ঞানে গুণী এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাদের শহরের জনগণের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলেন। এ যুগে ফিকহের বিভিন্ন সম্প্রদায় (School of thought) বা মাযহাব কায়েম হয়নি। বরং যে যার কাছ থেকে ইচ্ছা ফতোয়া গ্রহণ করতো এবং মুফতী নিজের জ্ঞান অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। যদি এই ফতোয়া সন্তোষজনক নয় মনে হতো অথবা কোন ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ হতো তাহলে অন্য কোন মুফতী ও ফকীহের কাছে একই ব্যাপারে ফতোয়া নেয়া হতো। এ ধরনের বিষয়কে দোষণীয় মনে করা হতো না।

মুফতী ও ফকীহ্ ছাড়া বিভিন্ন শহরে সরকারের পক্ষ থেকে কাযী (বিচারপতি) নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচার করতেন। যদি কুরআন ও হাদীসে তাঁরা কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশ না পেতেন, তাহলে বিখ্যাত ফকীহদের কাছ থেকে ফতোয়া নিতেন

অথবা নিজেদের প্রসূত মতের ভিত্তিকে ফয়সালা দিতেন। আবার কখনো তারা পত্রের মাধ্যমে খলীফার কাছ থেকেও ফয়সালা জেনে নিতেন।

খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের উন্নতি

এ যুগে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। খারেজীরা বিভিন্ন দীনী ব্যাপারে নিজেদের মতের ওপর অটল থাকে। এ কারণে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা এমন সব লোককে অগ্রাধিকার দিয়েছিল যারা ছিল তাদের বন্ধু ও সমমনা।

শিয়াদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার জন্ম হয়। তারা গায়ের শিয়া লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরন বা হাদীস গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়নি। ফল কথা এভাবে প্রত্যেক ফেরকা, দল ও সম্প্রদায় নিজেদের ইমামের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকাহ সংক্রান্ত ফয়সালা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেয়।

হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস

একদিকে যথাযথ পদ্ধতিতে হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য খলীফা হযরত 'উমর ইবনে আবদুল আযীয র. প্রচেষ্টা শুরু করেন। ইসলামী দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের শাসক এবং আলেমদের তিনি লিখে পাঠান, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সন্ধান করে তা জড় করতে থাকো। আমি ইলম ও উলামার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত।' অন্যদিকে তখন জাল হাদীস রচনা চলছিল।

জাল হাদীস রচনার কারণ

১. ইসলাম বিরোধী লোকদের ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার বাসনা।
২. মূর্খ সুফী ও আবিদগণের (ইবাদতে মশগুল) বাসনা, তাঁরা অনুপ্রেরণা মূলক ও ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীস তৈরী করে জনগণকে ধর্মকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।
৩. সংকীর্ণমনা এবং স্বল্প শিক্ষিত মুহাদ্দিসগণের খ্যাতি অর্জনের বাসনা।
৪. বিদ'আত প্রচারে উৎসাহী ও বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের নিজেদের মতবাদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার গরজ।
৫. বৈষয়িক স্বার্থান্বেষীদেরকে তাদের কর্মের স্বপক্ষে শরঈ দলীল পেশ করে খুশী করার ইচ্ছা।
৬. দুর্বল মতনের[১] দুর্বলতা দূর করবার জন্য প্রখ্যাত সনদ[২] জুড়ে দেয়া। কোন প্রখ্যাত সনদকে ওলট পালট করে বা কাটছাঁট করে দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ 'মতন'-এর সাথে যুক্ত করে যাতে তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রবল অভিযোগ না আসে এবং লোকেরা তাদের বিশ্বাস করে এবং বর্ণনার অভিনবত্বে বিস্মিত জনগণ তাদের 'ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।

এই সব উদ্দেশ্যে কোনো কোনো লোক মিথ্যে করে বলে দিত, 'আমি নিজের কানে এই হাদীস শুনেছি, আমি বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি' ইত্যাদি।
৭. সাহাবীদের উক্তি, আরবী প্রবাদ বাক্য ও জ্ঞানীদের জ্ঞানগর্ভ কাহিনীগুলোকে রসূলের সাথে সম্পর্কিত করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া।

সত্যানুসারীদের বিপুল সংখ্যা

একথা সত্য, কোনো যুগের মানুষ এক ধরনের হয় না এবং সব যুগেও সবার প্রবৃত্তি এক রকম ছিল না। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের কাছাকাছি হবার কারণে সত্যানুসারী এবং দীন ও ঈমানের জন্য জীবন উৎসর্গকারী লোকের সংখ্যা এযুগে ছিল প্রচুর। কিন্তু জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাবে মহাদ্দিসগণের জন্য হাদীস সংকলনের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ হয়ে পড়ে। যেভাবে জাল হাদীসের মিশ্রণ থেকে তাঁরা প্রকৃত হাদীসগুলোকে আলাদা করেন এবং কিভাবে তাঁরা এ কর্মে সাফল্য লাভ করেন তা ইসলামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

চতুর্থ যুগ

চতুর্থ যুগের বুনিয়াদ রচিত হয় তৃতীয় যুগেই। ঐ যুগে ফিকহের সংকলন ও গ্রন্থনার সূচনা হয়। তবে চতুর্থ যুগেই যথার্থভাবে ফিকহ লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়। ইসলামী বিশ্বের চর্তুদিকে যে মহান মর্যাদা সম্পন্ন ইমামগণ, যাঁদের মুকাল্লিদ তথা অনুসারীবর্গ চারদিকে ছড়িয়ে পরেছিলেন, নিজ নিজ ইমামের ফিকহী ফয়সালাকে নিজেদের বাস্তব জীবনে কার্যকর করে ছিলেন, সে ইমামগণ ছিলেন এই চতুর্থ যুগেরই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ফিকহের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ঃ
১. সভ্যতার ব্যাপকতার ফলে নতুন নতুন প্রয়োজনের জন্ম হয় এবং চিন্তা ও গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।
২. জ্ঞান চর্চার প্রসার। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন ও প্রসার ঘটে, যাতে পারস্পরিক আদান প্রদানের সুযোগ এবং দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন

৩. এ যুগেই হাদীস গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় সমস্ত ইসলামী শহরেই এ কর্মে মনোযোগ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রাখেন।

(১) মদীনায় ইমাম মালেক ইবনে আনাস র.।
(২) মক্কায় আবদুল মালিক ইবনে আবদিল আযীয র.।
(৩) কূফায় সুফিয়ান ছাওরী র.।

(৪) বসরায় হাম্মাদ ইবনে সালমাহ্ র. এবং সাঈদ ইবনে আবী 'আরুবা রা.।

(৫) ওয়াসিতে হাইশাম ইবনে শাব্বীর র.।

(৬) সিরিয়ায় আবদুর রহমান আওযাঈ র.।

(৭) য়ামেনে ইয়া'মার ইবনে আরশাদ র.।

(৮) খোরাসানে 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র.।

(৯) রায়-এ জারীর ইবনে আবদুল হামীদ র.।

হাদীস সংকলন ও গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করার প্রথম পর্যায়ে সাধারণত একই বিষয়ের যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি বিষয়ের হাদীসসমূহকে বিষয়ভিত্তিক সন্নিবেশিত করা হতো। তাছাড়া হাদীসের সাথে সাহাবার ও তাবেঈগণের উক্তিও যুক্ত করার প্রচলন ছিল। হাদীস সম্পর্কিত হতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের বানী সম্পর্কিত হতো তাদের নিজেদের সাথে। হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস এবং অন্যদের উক্তিগুলো পৃথক পৃথকভাবে সংকলন করেন। এ পর্যায়ে মুসনাদ নামে অভিহিত সংকলণের সৃষ্টি হয়; যাতে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলো তাঁর নামে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন মুসনাদে 'আবদুল্লাহ, ইবনে মূসা কুফী, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ মুসনাদে 'উছমান ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আসাদ ইবনে মুসা বসরী, এবং মুসনাদে নাঈম ইবনে হাম্মাদ। এঁরা সবাই এক একজন রাবীর বর্ণিত সমস্ত রেওয়ায়েত একই জায়গায় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন, হাদীসের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। এই বিন্যাস ছিল রাবী ভিত্তিক।

তৃতীয় পর্যায়ে হাদীসের এই বিশাল সঞ্চয় থেকে সঠিক হাদীস নির্বাচন করার জন্য বিস্তর যাচাই বাছাই করা হয়। এই যাচাই বাছাই, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাকারীদের শীর্ষে অবস্থান করেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী। তাঁরা দুজন ব্যাপক ও চুড়ান্ত পর্যায়ের যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনার পর যথাক্রমে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম নামক হাদীসের দুটি সংস্করণ তৈরী করেন। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে আরো চারটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। প্রণীত এই ছয়টি হাদীস গ্রন্থ 'সিহা-ই-সিত্তা' নামে পরিচিত। আরো বহু মুহাদ্দিস হাদীসের সংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা ঐ ছজনের মতো খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। যদিও কোনো কোনো বিবেচনায় তাদের সংকলন সঠিক এবং তাঁরাও খ্যাতির দাবীদার কিন্তু সামগ্রিকভাবে এইগুলো উপরোক্ত ছয়টি সংকলন অপেক্ষা নিম্নমানের।

জারাহ ও তা'দীল

এই যুগে মুহাদ্দিসদের একটি শ্রেণী হাদীসের রাবীদের অবস্থা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করাকে নিজেদের অভীষ্ট লক্ষে পরিণত করেন। এই দল রাবীদের ব্যক্তিগত গুণাবলী যথা

নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা, স্মরণশক্তি, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। এ দলের সদস্যরা রিজালে জারাহ ও তাদীল নামে খ্যাত হন।[৩]

উসূলে ফিক্হ প্রণয়ন ও ফিকহের মূল বিষয়ে মতবিরোধ

৪. এ যুগে উসূলে ফিকহ তথা ফিকহের মূলনীতিগুলো রচিত হয়। কিন্তু ফিকহী বিধান সমূহে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর নিম্নোক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ

ক) হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা এবং তা থেকে ফিকহের মাসায়েল উদ্ভাবনের যৌক্তিকতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতির ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে এবং প্রত্যেক ফকীহ্ নিজের মানদন্ড অনুযায়ী যাচাইয়ের নিয়ম কানূন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। কিছু সংখ্যক লোক দলীলরূপে হাদীস গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসেছিলেন। কিন্তু উম্মতে মুসলিমার ফকীহ গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলনা। বরং তাঁরা ওদের কঠোর সমালোচনা করেন। এমন কি ইমাম শাফে'ঈ র. ও অন্যেরা হাদীস অস্বীকারের এই মতবাদকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করেছেন।

খ) কিয়াস ও ইসতিহসানকে ইসলামী ফিকহের উৎস হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। মুহাদ্দিসগণ কিয়াস ব্যবহার করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করেন। ইমাম শাফে'ঈ র. ইসতিহসানের বিরোধিতা করেন। যাহেরীয়ারা (ইমাম দাউদ যাহেরীর নামের সাথে সম্পর্কিত) দলীলের শাব্দিক অর্থের উপর নির্ভর করতেন। তারা কিয়াস অস্বীকার করেন।

উল্লেখ্য, নিঃসন্দেহে এ যুগে কিয়াস খুব বেশী ব্যবহার হয়েছে। এতে হানাফীদের অংশ অনেক বেশী। হাম্বলী ও মালেকীদের অংশ সে তুলনায় অনেক কম। আর শাফে'ঈদের অংশ দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি।

গ) ইজমার শর্ত সমূহের ব্যাপারে মতবিরোধ ঃ এ জন্য ফিকহী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ) ফিকহী কোন হুকুমের কি মর্যাদা এবং কি দলীলে তা নিরূপিত হলো এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন কোন বিষয়টি ওয়াজিব এবং ওয়াজিব বলে গণ্য হতে হলে কিরূপ দলীলের প্রয়োজন হয়? ফকীহগণ এর নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন।

উল্লেখ্য এই চতুর্থ যুগে ফকীহগণ উসূলে ফিকহ বিষয়ে অসংখ্য কিতাব লেখেন। অসাধারণ সাফল্যের সাথে ইসলামী জ্ঞানের এই শাখাটির গ্রন্থনা করেন। পরবর্তী 'আলেমগণ এ ব্যাপারে পথ নির্দেশ লাভ করেন। এরি ভিত্তিতে তাঁরা ফিকহী হুকুম উদ্ভাবন করতে থাকেন।

৫) এই যুগে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা ভংগী এবং কতখানি জোরালো ভাষায় কর্মের নির্দেশ দেয়া বা কর্মের নিষেধ করা হয়েছে ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে কর্মের শ্রেণী বিভাগ সূচক পরিভাষা যেমন–ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব, মানদুব ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। এতেও কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ যুগের বিখ্যাত ফকীহগণ

(১) ইমাম আবু হানীফা র.। তাঁর যুগে কূফায় আরো তিন জন বড় বড় ফকীহ ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাওরী র., শারীক ইবনে আবদিল্লাহ নাখঈ র. মুহাম্মদ ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবি লাইলা র। ইমাম আবু হানীফা ও এঁদের মধ্যে প্রায়ই 'ইলমী বিতর্ক -আলোচনা চলতেই থাকতো। ইমাম আবু হানীফার শাগরিদদের মধ্যে যাঁরা বেশী খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

* আবু ইউসূফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আনসারী র.।
* মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ফরকদ শাইবানী র.।
* যুফার ইবনে হুযাইল ইবনে কায়েস কূফী র.।
* হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুয়ী কুফী।

(২) ইমাম মালেক ইবনে আনাস ইবনে আবী 'আমের। মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয় দলে তাঁর বহু শাগরিদ রয়েছেন। কারণ ইমাম মালেকের মধ্যে ফকীহ ও মুহাদ্দিস উভয়েরই গুনাবলী ছিল।

(৩) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফে'ঈ। তিনি শাফে'ঈ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইরাক ও মিসর উভয় এলাকায় তাঁর শাগরিদদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

(৪) ইমাম আহমদ ইবনে হামবল ইবনে হাম্বাল। মুহাদ্দিস ও ফকীহ উভয় দলে তাঁর শাগরিদদের সংখ্যাও যথেষ্ট।

খ্যাতির সাধারণ কারণ সমূহ

এই চারজন ইমামের মাযহাব খ্যাতি অর্জন করে এবং জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। এদের ফিকহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং টিকে থাকে। এঁদের খ্যাতি লাভের সাধারণ কারণগুলো নিচে দেয়া হলোঃ

১. তাঁদের সমস্ত 'রায়' অর্থাৎ প্রদত্ত বিধানগুলো সংগৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ইমামদের বিধান বিক্ষিপ্ত থেকে যায় এবং জন্য তাঁরা খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।
২. এঁদের শাগরিদগণ সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তাঁরা নিজেদের উস্তাদগণের 'রায়' জনগণের সামনে তুলে ধরলে তাদেরকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। শাগরিদগণ উস্তাদগণের রায় প্রচারে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন।

৩. কোনো কোনো মাযহাবের উদারতার কারণে এবং জনগণের প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা বেশী থাকায় তা সরকারের আইনে পরিণত হয়ে যায়।

যায়দিয়্যা ও ইমামিয়্যা সম্প্রদায়ের খ্যাতি

এ যুগে শিয়াদের দুই সম্প্রদায় যায়দীয়্যা ও ইমামীয়্যা এবং তাদের মযহাব দুটো খ্যাতি লাভ করে। যায়দীয়্যা সম্প্রদায়টি যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনের নামের সাথে সম্পর্কিত। এই ইমামদের জন্য ইজতিহাদ ছিল অপরিহার্য। এ কারণে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক স্বাধীন রায়ের ইমামের জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত ইমামগণ বেশী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

১. আল হাসান ইবনে আলী ইবনে হাসান যায়দ।
২. আল হাসান ইবনে যায়দ ইবনে মুহাম্মদ।
৩. কাসিম ইবনে ইবরাহীম।
৪. হাদী ইয়াহইয়া ইবনুল হাসান ইবনুল কাসিম।

ইমামীয়্যা সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ ছিল প্রধান দুইটি 'আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত। একঃ ইমাম অবশ্যই মা'সূম হবেন সুতরাং রসূলুল্লাহ স.-এর বংশধর হবেন, দুই ঃ হযরত আলী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর অর্থাৎ অসিয়তের মাধ্যমে মনোনীত ইমাম বা খালীফা, তার অধিকার হরণ করে আবু বকর প্রমুখেরা অবৈধভাবে খেলাফত করেছেন। ইমামীয়্যাদের যে শাখায় বারজন ইমামের প্রবক্তা (ইসনা আশারীয়া) তাদের সবচেয়ে বড় ইমাম ছিলেন আবূ আবদুল্লাহ জা'ফর সাদিক এবং তার পিতা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বাকের (প্রসংগত ইমামীয়্যাদের অন্য শাখাটির নাম সাবাইয়্যা অর্থাৎ সাত ইমামের প্রবক্তা। ইমামীয়্যাদের বিশ্বাস দ্বাদশ অথবা সপ্তম ইমাম গায়েব হয়ে গেছেন। শিয়াদের আরো অনেক ফেরকা রয়েছে।

কোনো কোনো মযহাব নিশ্চিহ্ন

কয়েকটি মযহাব কিছু কাল যাবত অনুসৃত হতো। কিন্তু পরবর্তী কালে চারটি মযহাবের প্রভাব বেড়ে গেলে অন্য মযহাবগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিলুপ্ত মযহাবগুলোর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহের নাম নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. আবূ আবদির রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল আওযাঈ,
২. আবূ সুলাইমান দাউদ যাহেরী,
৩. আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী।

কাল্পনিক অবস্থা ভিত্তিক ফিকহ

এ যুগের ফিকহ গ্রন্থাদিতে অনেক কল্পনা ভিত্তিক বিধান স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্ন জাগবার

পূর্বে ধারণা কল্পনা করে তার বিধান নির্দেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইরাকের ফকীহদের স্থান সর্বাগ্রে। তাঁদের প্রদত্ত এমন কিছু বিধানও আছে যা বহু যুগ অতীত হবার পরও হয়ত প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরী হবে। এতে ফিকহের ব্যাপকতা বেড়েছে। পর নির্ভরতা এবং সহজে কর্ম সাধন প্রবণতা অর্থাৎ ইজতিহাদ বিমুখিতা সৃষ্টি হয়েছে।

এই চতুর্থ যুগের ইসলামী ফিকহের সমুদয় রচনাবলী সংরক্ষিত রয়েছে। যা অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ।

– অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

তথ্যপঞ্জি

১. যে শব্দ গুলোতে হাদীসের বক্তব্য প্রকাশিত হয় তার সমষ্টিকে হাদীসের 'মতন' বলা হয়।

২. হাদীস বর্ণনাকারী (রাবী)-দের নামের সমষ্টিকে হাদীসের সনদ বলা হয়।

৩. জারাহ ও তাদীল এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত নানা দোষে দুষ্ট এবং প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্জনযোগ্য। তৃতীয় এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়েত গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসের ভাষাও এই বিচার-বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ ভাষাগত বিচারে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য কি-না তাও যাচাই করা হতো। ফলকথা এযুগে হাদীসের জারাহ ও তা'দীল জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয় এবং বিস্তর লোক একাজে নিয়োজিত ছিলেন।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩-৫২

আল-মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা (ইসলামী ফিকাহ বিশ্বকোষ)-এর ভূমিকা

[আল-মাওসূয়াতুল ফিক্হিয়্যা কুয়েত সরকারের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও প্রকাশিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফিকাহ বিশ্বকোষ। ৪৫ খণ্ডে বিভক্ত এই বিশ্বকোষে সর্বমোট প্রায় ২০০০ ভুক্তি রয়েছে। এতে ফিকহের যাবতীয় তথ্যাবলী প্রচলিত পরিভাষাসমূহের ভিত্তিতে আরবী বর্ণানুক্রম অনুসারে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইসলামী আইন চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটি সকলের জন্য নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় এর অনুবাদ কার্যক্রম চলছে। বাংলাভাষী বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এ বিশ্বকোষটি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুবাদের সূচনাস্বরূপ বিষয়ভিত্তিক তিন খণ্ডের অনুবাদ সংকলনের কাজ চলছে। এর অংশ হিসেবে আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যার ভূমিকার প্রথম কিস্তি পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো। - সম্পাদক]

শুরুর আগের কথা ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন জীবন বিধান। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান এবং তাঁর বান্দাদের সার্বিক কল্যাণের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ। আমরা আরো সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদ স. আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ রিসালাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন, নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করেছেন এবং দীনকে পূর্ণতা দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি এই রাসূলের প্রতি যিনি আল-আমীন, যিনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন, আমানত পৌঁছে দিয়েছেন, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন, অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি রফীকুল আ'লার কাছে চলে যাননি, যতক্ষণ না তাঁর নাজিলকৃত কিতাব বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সুচারুরূপে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ, সাথীগণ এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা উত্তমরূপে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতিও দরূদ ও সালাম।

'ইলমুল ফিক্হ' ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। কেননা এটি এমন আইন যদ্বারা প্রত্যেক মুসলমান তার কর্মকান্ডকে পরখ করে নিতে পারে, কাজটি হালাল না হারাম, সঠিক না ভ্রান্ত? সব যুগেই মুসলমানগণ তাদের কর্মকান্ডের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন তা হালাল না হারাম, সঠিক না ভুল, হোক সেটি আল্লাহ্ বা তাঁর বান্দার মধ্যে সম্পর্কিত অথবা বান্দাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কিত বিষয়। তা নৈকট্যের কিংবা দূরত্বের, শত্রুতার কিংবা বন্ধুত্বের, শাসকের কিংবা শাসিতের এবং মুসলিম কিংবা অমুসলিম যার সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন।

ইলমুল ফিক্‌হ এর মাধ্যমেই কেবল এসব বিষয়ে জানা যায়। এতে বান্দাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধান আলোচনা করা হয়েছে, তা অবধারিত ঐচ্ছিক কিংবা উদ্ভাবিত যাই হোক। অবধারিত বিধানটি হতে পারে কোন কাজ করার অথবা কোন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। যথাযথ স্থানে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্‌।

ফিক্‌হ্‌-এর বিষয়টি অন্যান্য জ্ঞান শাস্ত্র বা প্রাণী জগতের মত, যা চর্চা, বাস্তবে প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে এবং অবহেলার কারণে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। এ শাস্ত্র অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করে বিস্তার লাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে এবং জীবনের প্রতিটি দিককে নিজ আওতাভুক্ত করেছে। যুগে যুগে এ শাস্ত্রের অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে এবং তার ক্রমোন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে অথবা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কেননা ইচ্ছায় কিংবা অবহেলায় হোক জীবনের অনেক বিষয় থেকে একে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাদের জীবনাচার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংগতিহীন বিজাতীয় আইনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে। তারা বিজাতীয় আইনের অনিষ্টকর দিকের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এর বাহ্যিক চমকে মুগ্ধ হয়েছে এবং সেখান থেকে কিছু আইন গ্রহণ করে নিজেদের সমাজ জীবনে প্রয়োগ করেছে। ফলে মুসলমানদের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং যাবতীয় সমস্যা জটিলরূপ ধারণ করেছে। এসব মুসলিম দেশের মধ্যে কোন কোন দেশে সর্বপ্রথম দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া হয়েছে হুদূদ (নির্ধারিত গুরুদণ্ড) কিসাস (মানবজীবন ও দেহের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধের শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তি ও তা'যীর (বিচারকের বিবেচনা ভিত্তিক দণ্ড) সংক্রান্ত ইসলামী আইন থেকে। অতঃপর এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের মনগড়া দেওয়ানী আইনসমূহ যা ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ্‌ যে সুদ, ফাসিদ (অবৈধ) ক্রয়-বিক্রয় ও বাতিল লেনদেন হারাম করেছেন তারা তা বৈধ ঘোষণা করেছে। এভাবে তারা মানুষের জীবনকে জটিল করে তুলেছে। একইভাবে তারা বিচার প্রার্থনার পথকেও দুর্গম করে দিয়েছে, এমনকি বহু লোক আইনী জটিলতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা জনিত ভোগান্তির আধিক্যের কারণে তাদের আইনানুগ অধিকার দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

হিজরী ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ফকীহগণের শ্রম ও গবেষণা পারিবারিক আইন-এর গবেষণায় গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এ বিভাগটিকে ব্যক্তিগত বিষয় (ণেব্রমভটফ ওর্টদ্র) নামে অভিহিত করা হয়েছে; বরং কোন কোন রাষ্ট্র সংশোধন ও সংস্কারের নামে ইসলামী আইনের উপর অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করে এর দুর্নাম রটনা করেছে।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর অব্যাহত আঘাত সত্ত্বেও সেটি তার মজবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ কাঠামোর কারণে দৃঢ়ভাবে যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যাচ্ছে। আর আল্লাহ্‌ এই উম্মতকে তাদের সুখ নিদ্রার পর পুনর্জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা চতুর্দিক থেকে বজ্রকঠোর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, যা সকল বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহর আইনের দিকে প্রত্যাবর্তনের জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে। কোন কোন রাষ্ট্র এ ডাকে সাড়া দিয়ে আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের কাঠামোয় ফিরে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কুয়েত এদের অন্যতম। ১৯৭৭ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৩৯৭ হিজরী রবিউল আওয়াল মাসের শুরুতে সেদেশের মন্ত্রী

পরিষদ দেশের সকল আইন-কানুন ইসলামী শরীয়তের আলোকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত জারী করে। এ উদ্দেশ্যে একটি কমিশনও গঠন করা হয়। আশা করা যায়, আল্লাহ্ সকলকে তার শরীয়ত অনুযায়ী কাজ করার তাওফীক দান করবেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রয়োগ সহজ করে দেবেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ যেভাবে সামরিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনী আগ্রাসন থেকেও মুক্ত হতে পারে।

ভূমিকা (المقدمة)

আইন প্রণয়নে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সুবিধার্থে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে একটি ***ভূমিকা*** উপস্থাপন করেছি। এখান থেকে শিক্ষার্থী, ফকীহ ও পণ্ডিতগণসহ সকলে উপকৃত হতে পারবেন। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করার জন্য রেখে দিয়ে আমরা এ ভূমিকায় শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুই উল্লেখ করবো যাতে পাঠকগণ দ্বিধামুক্ত থাকতে পারেন। অবশ্য আমাদেরকে সঠিক পথে হেদায়াত দানের মালিক আল্লাহ্।

ইসলামী ফিক্হ (الفقه الإسلامي)

ফিক্হ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ সাধারণ অর্থ বুঝ, হৃদয়ংগম, উপলব্ধি, অনুধাবন, তা বাহ্যিক বা অপ্রকাশ্য হোক। আল-কামূস ও আল্-মিসবাহুল মুনীর অভিধানে এরূপ অর্থই করা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের মতের অনুকূলে শু'আইব আ.-এর জাতির ঘটনা সম্পর্কিত আল্লাহ্র বাণীকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ.

'তারা বললো, হে শু'আইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথা আমরা বুঝি না।'[১] আরো এই যে,

وَإِنْ مِّنْ شَيْئٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.

'প্রতিটি জিনিসই (সৃষ্টি) তাঁর স-প্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।' আয়াত দু'টি প্রমাণ করে ফিক্হ দ্বারা সাধারণ বুঝ বা উপলব্ধি বুঝায় না।[২]

একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, ফিক্হ শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করা। যেমন বলা হয়, فقهت كلامك 'আমি তোমার কথা অনুধাবন করতে পেরেছি'। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এবং যে তাৎপর্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে আমি তা বুঝেছি। এ কথা বলা হয় না, আমি আসমান ও জমিন সব বুঝেছি।

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ পর্যালোচনাকারী মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, ফিক্হ শব্দটি কেবল সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা রশীদ রেযা আল মিসরী র. তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (আল-মানার) উল্লেখ করেন যে, ফিকহ শব্দটি আল কুরআনের বিশটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, তন্মধ্যে উনিশ স্থানে তা সূক্ষ্ম জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

...র বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ.

'এবং তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।'[৩]

ইতিপূর্বে উল্লেখিত আয়াত দুটিতে সাধারণ উপলব্ধিকে নাকচ করা হয়নি। বরং হযরত শু'আইব আ. এর জাতির কথায় তাঁর দাওয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারার কথা বলা হয়েছে। কারণ তাঁর কথার বাহ্যিক অর্থ সকলেই বুঝেছে। আর সূরা ইসরাঈলের আয়াতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রতিটি জিনিসের তাসবীহ পাঠের তাৎপর্য উপলব্ধিকে নাকচ করা হয়েছে। কারণ সাধারণ উপলব্ধি দিয়েই বুঝা যায়, প্রতিটি জিনিস ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছে। কেননা সেগুলো তাঁর হুকুমের দাস। যাই হোক; আমরা এখানে বিশেষ করে যা বুঝাতে চাই তা হলো, ফকীহ ও উসূলবিদগণের নিকট গৃহীত ফিকহের অর্থ। কারণ এটিই আমাদের আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত। উসূলবিদ ও ফকীহগণের নিকট ফিক্‌হের সংগায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

ক. উসূলবিদগণের মতে ফিকহ্-এর সংগা ঃ উসূলবিদগণ ফিকহের সংগা ধারাবাহিক তিনটি স্তরে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ ফিক্‌হ্ শব্দটি শার'উন (شرع) শব্দের সমার্থক। এ স্তরে ফিকহ্ বলতে বুঝায় মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেগুলো মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, আখলাক এবং অংগ প্রত্যংগের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে -

هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا 'মানুষের উপকার ও অপকার বিষয়ক জ্ঞানকে ফিকহ্ বলে।'

এ কারণেই তিনি তাঁর আকাইদ বিষয়ক পুস্তকের নামকরণ করেছেন 'আল- ফিকহুল- আকবার'।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরে ইলমুল আকায়েদ ও ইলমুল ফিকহকে স্বতন্ত্র দুই শাস্ত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। ইলমুল আকায়েদকে বলা হতো ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল কালাম, এ স্তরে ফিকহের সংগা দেয়া হয়েছে ঃ

العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستعدة من الأدلة التفصيلية.

'বিশদ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সংকলিত শরীয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিকহ্ বলে।' এখানে মূল বিষয় অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস ছাড়া অন্যগুলোকে আনুষঙ্গিক হিসাবে বুঝানো হয়েছে। কারণ আকীদা-বিশ্বাস হলো শরীয়তের মূল, যার উপর সবকিছুর ভিত্তি স্থাপিত। এই সংগা শরীয়তের ব্যবহারিক

বিষয়সমূহ তথা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। তদ্রূপ এই সংগা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধানকেও অন্তর্ভুক্ত করে যেমন প্রদর্শনেচ্ছা, হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব অহংকার হারাম এবং বিনয়, নম্রতা, অপরের কল্যাণ কামনা হালাল হওয়া সম্পর্কিত ইত্যাকার বিষয়ের বিধান যা আখলাকের সাথে সম্পর্কিত।

তৃতীয় স্তর ঃ যার উপর আমাদের বর্তমানকালের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অভিমত স্থিত হয়েছে, তা হলো ঃ

هو العلم بالأحكام الفرعية الشرعية العملية المستعدة من الأدلة التفصيلية.

'বিশদ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সংকলিত ব্যবহারিক শরীয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিক্হ্ বলে।'

সর্বশেষ এই সংগাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফিকহের আওতায় পড়ে না।

(ক) সত্তাগত ও গুণাবলী সম্পর্কিত সচরাচর জ্ঞান ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তা বিধি-বিধান বিষয়ক জ্ঞান নয়।

(খ) বুদ্ধিবৃত্তিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ভাষাগত ও মানবরচিত বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলো শরীয়তের বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান নয়।

(গ) দীনের মূল ভিত্তি আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত শরয়ী বিধান অথবা অন্তরের কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট শরীয়তের বিধান যেমন, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রদর্শনেচ্ছা, গর্ব, অহংকার হারাম, ইত্যাদি ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে উসূলে ফিকহের বিধান, যেমন, খবরে আহাদের উপর আমল করার বাধ্যবাধকতাও ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলোও মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞান, ব্যবহারিক জ্ঞান নয়। অথচ ইলমূল ফিকহ্ শুধুমাত্র ব্যবহারিক বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(ঘ) ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হযরত জিবরাঈল ও রসূলুল্লাহ স. এর জ্ঞান ও ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এসব জ্ঞান ইসতিমবাত (উদ্ভাবন) ও ইসতিদলালের (যুক্তি দর্শন) মাধ্যমে অর্জিত হয়নি বরং কাশ্ফ ও ওহীর মাধ্যমে লাভ হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ স.-এর ইজতিহাদ প্রসূত জ্ঞানকে ফিকহ বলতে বাধা নেই।

(ঙ) অনুরূপভাবে দীনের অতি আবশ্যকীয় জ্ঞান, যেমন নামায, যাকাত, রোযা, সামর্থ্যবানদের জন্য হজ্জ ইত্যাদি ফরজ বিষয়সমূহ এবং সুদ, মাদক গ্রহণ, যেনা, জুয়া ইত্যাদি হারাম বিষয়সমূহের জ্ঞান ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলোর জ্ঞান ইসতিমবাতের (উদ্ভাবন) মাধ্যমে অর্জিত হয়নি, অবশ্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের জনসাধারণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে বুদ্ধিমান বালক এবং এখানে বেড়ে উঠা সকলেই এ বিষয়গুলোর জ্ঞান রাখে। এ সংক্রান্ত নির্দেশসমূহ ইলমুল আকায়েদের শ্রেণীভুক্ত। আর আকায়েদের এ বিষয়গুলোর কোনটি কেউ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

(চ) আলেমগণ তাক্লীদের ভিত্তিতে শরীয়তের আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর যেসব বিধানের জ্ঞান অর্জন করেছেন। যেমন হানাফীদের মতে, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করলেই ফরজ আদায় হয়ে যায়, বিতর ও দুই ঈদের নামায ওয়াজিব, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ গড়িয়ে পড়লে অযু নষ্ট হওয়া এরূপ অন্যান্য বিধান। আবার শাফেয়ীদের মতে, মাথার কিয়দাংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট, সাধারণভাবে গায়রে মুহাররাম নারীকে স্পর্শ করলে অযু নষ্ট হওয়ার জ্ঞান এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ওলী ও দু'জন সাক্ষীর আবশ্যকতা সংক্রান্ত জ্ঞান ফিকহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এসব আহকামের জ্ঞান ইসতিমবাতের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি, তাক্লীদের ভিত্তিতে অর্জিত হয়েছে।

(ছ) এই সংগা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, উসূলবিদগণের মতে মুকাল্লিদকে ফকীহ্ বলা যায় না, যদিও তিনি ফিকহ্ সম্পর্কে তার আনুষঙ্গিক বিষয়সহ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। তাদের মতে তিনিই ফকীহ্ হতে পারেন যার উদ্ভাবনী (ইসতিমবাত) দক্ষতা ও প্রতিভা আছে এবং যিনি বিস্তারিত দলীল প্রমাণ থেকে বিধানসমূহ উদ্ভাবনে সক্ষম। ইসতিমবাতের এই যোগ্যতা থাকলে ফকীহ্ হওয়ার জন্য আনুষঙ্গিক সকল বিধান সম্পর্কে তার জ্ঞাত থাকা জরুরি নয়। কেননা আইনের কোন কোন বিভাগের মধ্যেই অধিকাংশ বিখ্যাত ইমামের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। কতক বিষয় সম্পর্কে তাদের বিরত থাকার কারণ এই যে, হয় তাদের দলীল ছিল এমন সাংঘর্ষিক যে একটির উপর অন্যটিকে অগ্রাধিকার দেয়া কঠিন ছিল অথবা সংশ্লিষ্ট বিধানের সমর্থনে কোন দলীল তাদের কাছে পৌঁছেনি।

খ. ফকীহ্গণের মতে ফিক্হ্-এর সংগা

ফকীহ্গণের মতে ফিকহ্ শব্দটি নীচের দু'টি অর্থের যে কোন একটি অর্থে প্রযোজ্য হয়।

(এক) কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত বিধান অথবা ইজমা প্রসূত বিধান অথবা শরীয়ত সমর্থিত কিয়াসের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধান অথবা উপরোক্ত দলীল সমূহের আশ্রয়ী দলীলের ভিত্তিতে গঠিত শরীয়তের ব্যবহারিক কতক বিধানাবলী দলীলসহ বা দলীল ছাড়া আয়ত্ত করাকে ফিকহ্ বলে। অতএব ফকীহ্দের মতে, ফকীহ্ হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য মুজতাহিদ হওয়া আবশ্যক নয়, যেমনটি উসূলবিদগণের মতে আবশ্যক। কি পরিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত করলে কোন ব্যক্তিকে ফকীহ্ উপাধি দেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ফকীহ্গণ আলোচনা করে বিষয়টি স্থানীয় উরফ (ঐতিহ্যের ঃ উর্ল্রমব)-এর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান উরফ অনুযায়ী এমন ব্যক্তিকেই ফকীহ্ বলা যেতে পারে, যিনি ফিকহের সুবিস্তৃত সংকলন থেকে প্রয়োজনীয় আইনটি সহজেই খুঁজে বের করতে পারেন। কোন কোন মুসলিম দেশের জনসাধারণ কুরআনের হাফেজকেও ফকীহ বলে থাকেন, যদিও তিনি অর্থ বুঝেন না।

ফকীহ্গণের ঐকমত্য অনুযায়ী যার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত, যিনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, গভীর উপলব্ধি শক্তির অধিকারী, সুস্থ ফিকহী স্বভাবসম্পন্ন তাকেই কেবল জাত ফকীহ (فقيه النفس) বলা যেতে পারে, যদিও তিনি মুকাল্লিদ হয়ে থাকেন।

(দুই) শরীয়তের যাবতীয় ব্যবহারিক বিধি বিধান ও মাসআলা-মাসায়েল বুঝাতে ফিকহ্ শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখানে মাছদার (ক্রিয়ামূল) ব্যবহার করে উদ্দিষ্ট বস্তু বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী

هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি[8] আয়াতে 'খালক' (সৃষ্টি) দ্বারা 'মাখলূক' (সৃষ্টিকূল) বুঝানো হয়েছে।

ফিক্‌হ (الفقه) শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ

ক. দীন (الدين) ঃ অভিধানমতে দীন শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্নার্থক (المشتركة) শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিভাষা- গুলো তুলে ধরা হলো।

১. প্রতিদান (الجزاء) ঃ যেমন আল্লাহ্‌র বাণী (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) 'প্রতিদান দিবসের মালিক'[৫] أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ "আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো তখনও কি আমাদের প্রতিদান দেয়া হবে?[৬]

২. পথ (الطريقة) ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ. 'তোমাদের জন্য তোমাদের পথ আমার জন্য আমার পথ।'[৭]

৩. শাসন ক্ষমতা (الحاكمية) ঃ যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَقَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ

'যাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মানে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করো।'[৮]

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِىْ أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ.

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি তোমাকে ওহী করেছি।'[৯]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্ম অনুযায়ী দীন বলতে এমন সব বিধি-বিধানের সমষ্টিকে বুঝায়, যা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর বান্দাদের জন্য পছন্দ করেছেন।

পরিভাষায় দীন হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রবর্তিত এমন সার্বিক বিধি-বিধান যেগুলো মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ এবং ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত।

ফিকহের এই পারিভাষিক অর্থটি ফিকহ-এর যে প্রাসঙ্গিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখিত অর্থ অনুযায়ী দীনকে 'ফিকহ' শব্দের সমার্থক ধরা যায়।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ.

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো যাবত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দীনের শাসন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।'[১০]

খ. শরীয়ত ও শিরআহ (الشرعة والشريعة)
অভিধানে শরীয়ত শব্দের অর্থ চৌকাঠের নিম্নাংশ, পথ, পানির উৎস। অনুরূপভাবে শিরআহ শব্দটিও একই অর্থবোধক। ভাষাবিদদের মতে, শরীয়ত শব্দটি শারউ' الشرع।-এর স্থলে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَتَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ.

"এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে না।[১১] অন্যত্র এসেছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَا جًا

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি"।[১২]
আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ব্যবহারিক জীবনের বিধি-বিধানকে বুঝানোর জন্য আধুনিককালে শরীয়ত (شريعة) শব্দটির বেশী প্রয়োগ হচ্ছে। এরূপ প্রয়োগের ফলে পরবর্তী কালের আলেমগণের মতে শব্দটি ফিকহ্-এর সমার্থক।
উল্লেখ্য পৃথিবীর বিভিন্ন আসমানী শরীয়তের মধ্যে কার্যত যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তার সবই আনুষঙ্গিক বিষয়ের ক্ষেত্রে, অন্যথায় সকল আসমানী শরীয়তের মূল বিধানসমূহ এক ও অভিন্ন।

গ. আইন প্রবর্তন (التشريع)
আত্-তাশরী (التشريع) শব্দটি আভিধানিক ভাবে শাররা'আ (شَرَّعَ) -এর ক্রিয়ামূল। অর্থ আইন বা আইনের সূত্র তৈরী করা।
পরিভাষায়

هو خطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلبًا أوتخييرًا أو وضعًا

আত্-তাশরী হলো বান্দার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্য, তা অবধারিত, ঐচ্ছিক অথবা উদ্ভাবিত যে কোন প্রকার হতে পারে।
জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের অধিকার নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বাণী ঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ.

'আইন প্রবর্তনের কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্‌রই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'[১৩]

তাই কোন ব্যক্তিই শরীয়তের বিধান রচনা করতে পারে না–সেটা আল্লাহ্‌র অধিকার সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট হোক। এটা হবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ এবং তিনি নিজের জন্য যা নির্দিষ্ট (খাস) করে নিয়েছেন তাতে হস্তক্ষেপের নামান্তর। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلاَلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। ওদের সুখ-সম্ভোগ যৎকিঞ্চিত এবং ওদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'[১৪]

রসূলুল্লাহ্-এর এতো উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর শরীয়তের বিধান রচনার অধিকার নেই। তাঁর শুধু ব্যাখ্যা করার অধিকার রয়েছে এবং তাঁর কর্তব্য হচ্ছে শরীয়তের প্রচার করা।

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه.

'হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করো; যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।'[১৫]

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

'তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি, মানুষকে স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।'[১৬]

শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের অধিকার প্রসঙ্গে সকল মুসলমান একমত; বরং সব আসমানী শরীয়তও এ বিষয়ে একমত। এক্ষেত্রে শুধু তারাই দ্বিমত করতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করে না।

ইজতিহাদ (الإجتهاد)

ইজতিহাদ শব্দটি جهد ক্রিয়ামূল থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থ অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা, কঠোর শ্রম ইত্যাদি। কামূস অভিধানে جهد অর্থ বলা হয়েছে الطاقة (সক্ষমতা) ও المشقة (কষ্ট)। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান পাওয়া না গেলে সেই বিষয়ে সঠিক বিধান নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত গবেষক কর্তৃক তাঁর সার্বিক শক্তি, যোগ্যতা ও সামর্থ নিয়োগ করে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াসকে ইজতিহাদ বলে।

ফিকহ্ ও উসূল বিশেষজ্ঞগণ ইজতিহাদের বিভিন্ন সংগা দিয়েছেন, যার প্রতিটিই শব্দবিন্যাসে ভিন্নতর হলেও অর্থের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি। প্রতিটি সংগার মূল বক্তব্য হচ্ছে, বিভিন্ন দলীল থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। মুসাল্লামুস সুবুত প্রণেতা আরেকটু সূক্ষ্মভাবে তার সংগায় বলেছেন, 'কোন ফকীহর শরীয়তের ظنى বা ধারণামূলক বিধি-বিধান উদ্‌ঘাটনের লক্ষে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করাকে ইজতিহাদ বলে।'

ইজতিহাদ আইনের স্বতন্ত্র কোন উৎস নয়, বরং আইন সম্পর্কিত গবেষণা। ইজতিহাদ প্রসূত অভিমত সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। তাই শুধুমাত্র ظنى বা ধারণামূলক মাসআলার ক্ষেত্রেই ইজতিহাদ প্রযোজ্য। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'মুজতাহিদ ভুল করতে পারেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌছতে পারেন।'

ইজতিহাদি মাসআলাসমূহ অতীতে এবং বর্তমানে ফকীহদের মধ্যকার মতপার্থক্যের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে। অন্যদিকে দীনের মূল হিসাবে বিবেচিত আকীদা-বিশ্বাস, আয়াতে মুহকামাত (হালাল হারামের বিধান সম্বলিত আয়াত) ইত্যাদিতে তা'বীল ও মতপার্থক্যের কোন সুযোগ নেই। যেমন, মিরাসের আহকাম, হুদুদ এবং কিসাসের আয়াত।

ইজতিহাদি মাসআলায় ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ মতপার্থক্যে যদি ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা না হয় তাহলে এটা উম্মতের জন্য রহমত। অতীতে সাহাবায়ে কিরামে মধ্যে বিভিন্ন মাসআলায় মতপার্থব্য হয়েছে। কিন্তু তাদের মত পার্থক্য পরস্পর বিরোধ ও হিংসা-বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়নি।

ইজতিহাদ ও গবেষণা শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী শরীয়া সংক্রান্ত গবেষণাকে ইজতিহাদ বলা হয় এবং এক্ষেত্রে গবেষণাকারীকে অবশ্যই মুসলমান হতে হয়। কিন্তু গবেষণা যেকোন বিষয়ে হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে গবেষকের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। অতএব গবেষণা শব্দটি ব্যাপকার্থক এবং ইজতিহাদ শব্দটি বিশিষ্টার্থক।

ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের পার্থক্য

মানবরচিত আইনের কোন কোন গোঁড়া সমর্থক বলেন, ইসলামী আইন হলো কতিপয় আলেম-ওলামার মতামতের শব্দ সমষ্টি, এই আইনকে অস্বীকার করলে শরীয়তকে অস্বীকার করা হয় না। তারা আরো বলেন, ইসলামী ফিক্‌হ আধুনিক কালের সমস্যাবলী এবং নতুন নতুন বিষয়ের সমাধান দিতে অক্ষম! আরেকটু অগ্রসর হয়ে কেউ কেউ বলেছেন, প্রাচীন মিসরীয় ও আসূরীয় সভ্যতার মত ইসলামী আইন ও ইতিহাসের পাতায় চলে গেছে।

উপরোক্ত অভিযোগের জবাবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামী আইনে ফকীহগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও অভিমত থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে শরয়ী নস (Text) তথা কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এছাড়া শরীয়তের অন্য দু'টি উৎস ইজমা' ও কিয়াসও প্রকারান্তরে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। উদাহরণ স্বরূপ কোন বিষয়ে ইজমা'র জন্য তার সমর্থনে অবশ্যই কুরআনের আয়াত অথবা নির্ভর যোগ্য সনদে বর্ণিত হাদীস বিদ্যমান থাকতে হবে। তাই ইসলামী আইনকে নিছক আলেম ওলামার বক্তব্য বলার অবকাশ নেই।

ইসলামী ফিকহ-এর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা মূলত এর উৎসমূলের পবিত্রতার কারণে। তাই আমরা দেখি যেকোন লোকের শরয়ী ভিত্তিহীন অভিমত যুগে যুগে ফকীহগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদিকে যুগে যুগে মানব রচিত আইন প্রণীত হয়েছে ক্ষমতাসীনদের সন্তুষ্টি ও স্বার্থ সংরক্ষণে এবং অনবরত পরিবর্তিতও হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। এসব আইন প্রণয়নে কোন আদর্শিক মূলনীতি প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা গোষ্ঠী স্বার্থ।

ইসলামী আইন যুগ সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম নয়-বিরোধীদের এই দাবিকে ইতিহাস সমর্থন করে না। কেননা এ আইনে সুদীর্ঘ ১৩ শত বছর ধরে অসংখ্য জাতি ও দেশ শাসিত হয়েছে। আর সেকালে উদ্ভূত প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ইসলামী আইনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

ইসলামী আইন ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে-ইসলাম বিরোধীদের এ দাবি অবান্তর। ইসলাম সর্বকালের উপযোগী একটি গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। বর্তমান কালেও পৃথিবীর অসংখ্য জনপদ ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তারা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রেখেছে। বস্তুত মানব রচিত আইনই অতিসত্তর ইতিহাসের পাতায় কাফন পরতে যাচ্ছে। এ আইনের নেতিবাচক প্রভাবে আজ মানবতার নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। তাই অতি অল্প সংখ্যক সুবিধাভোগী শ্রেণী ছাড়া গোটা মানবজাতি এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। আর 'আল্লাহ্ তা'আলা তার দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন, যদিও মুশরিকদের কাছে তা অপছন্দনীয়।

ইসলামী আইন দর্শন ও মানব রচিত আইন দর্শনে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কাজের অবশ্যই ইহকালীন ও পরকালীন পরিণতি রয়েছে। অতএব কোন ব্যক্তির পার্থিব পরিণতি থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থ মোটেও পরকালীন পরিণতি থেকে মুক্তি পাওয়া নয়। এ জন্যই প্রতিটি বিষয়ে ফকীহগণকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যায় যে, সেটি হালাল (বৈধ) না হারাম (অবৈধ), ফরয (আবশ্যকীয়) না নফল (ঐচ্ছিক)। অন্যদিকে মানব রচিত আইনে পরকালীন জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। তাই সেখানে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ-অবৈধের কোন তোয়াক্কা করা হয় না, বরং নানা রকম চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয়।

ফিকহ্ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের স্তরসমূহ

আলোচ্য ভূমিকায় ফিক্হ শাস্ত্রের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ 'আইনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস' নামে জ্ঞানের আলাদা শাখা রয়েছে। তবে এখানে সেই ইতিহাসের প্রতি সামান্য আলোকপাত করতে চাই। যেন পাঠকগণ বিষয়টি সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করতে পারেন এবং অন্যান্য

জাতির আইন ব্যবস্থা থেকে ইসলামী আইন ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে।

ইসলামী ফিক্‌হ-এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে, যার পূর্ববর্তী স্তরের সাথে পরবর্তী স্তরের এত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, এ ধরনের বেশ কিছু স্তর অতিক্রম করে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ হয়েছে। এসব স্তরের প্রতিটি পরস্পরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাই প্রতিটি স্তরকে নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে রসূলুল্লাহ স.-এর যুগ বা স্তরের কথা স্বতন্ত্র। কেননা অন্যান্য স্তর থেকে এই স্তরটি রসূলুল্লাহ স.-এর ইনতিকালের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

সামগ্রিকভাবে ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ নবুওয়াতের যুগ (عصر النبوة)

এটি ছিল নবী করীম স.-এর মক্কী ও মাদানী যুগ। এ কালে উদ্ভূত প্রায় সকল সমস্যার সমাধান ওহীর মাধ্যমে হতো। যেসব বিষয়ে সরাসরি ওহীর নির্দেশনা ছিল না সেক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. ইজতিহাদ করতেন অথবা সাহাবীদের কেউ কেউ রসূলুল্লাহর স. উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করে তাঁকে জানানোর পর তিনি ওহীর ভিত্তিতে তা গ্রহণ করতেন অথবা প্রত্যাখ্যান করতেন। আল্লাহ তা'আলা যে ইজতিহাদকে ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতেন তা শরীয়তের বিধান হিসাবে গণ্য হতো। তাই সে সময় স্বতন্ত্রভাবে ফিকহশাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

এখানে একটি বিষয় একেবারেই স্পষ্ট যে, নবী যুগে ইসলামী আইন কোন দিক থেকেই বিদেশী আইন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। কেননা নবী করীম স. ছিলেন উম্মী, তিনি কখনো কোন শিক্ষকের দ্বারস্থ হননি। তাই ইসলামী আইনে রোমান ও পারস্য আইনের কোন প্রভাব পড়েনি। তাই কোন ব্যক্তি এমনকি ইসলামের ঘোরতর শত্রুও দাবি করতে পারবে না যে, এই যুগে ইসলামী শরীয়ত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

যে কোন সমাজের মানবগোষ্ঠীর মাঝে স্থানীয় ভাবে কিছু রীতিনীতি ও প্রথার প্রচলন দেখা যায়। শরীয়ত এর মধ্যকার কিছু প্রথাকে বহাল রেখেছে এবং কিছু প্রথাকে বাতিল করেছে। যেমন কাউকে আপন পুত্রের মত পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করার রীতি, স্ত্রী সাথে যিহার, বিভিন্ন প্রকার অবৈধ বিবাহ ও সুদ প্রথা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে।

নবী যুগে পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ সংকলন করা হয়নি। আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে রসূলুল্লাহ স.-এর কথা মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কুরআন মজীদ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ প্রণয়ন সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কারণ অতীতে দেখা গেছে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে তাদের নবী, পাদ্রী ও সন্যাসীদের কথা মিশিয়ে সবটাকে আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে চালিয়ে দিয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ স. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইবনুল আস-সহ মুষ্টিমেয় সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর মুখনিসৃত বাণীগুলো সাদিকা' নামক একটি সহীফায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া রসূলুল্লাহ্‌ স. হযরত আলী রা.-কে নরহত্যা ও দিয়াত (রক্তপণ) সংক্রান্ত বিধানসমূহ লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ স. দীর্ঘ তেইশ বছর রিসালাতের দায়িত্ব পালন শেষে রফীকুল আ'লায় (মহান আল্লাহর কাছে) ফিরে যান। তিনি নবুওয়াতী জীবনের প্রথম তের বছর দাওয়াতী কাজ করেছেন মক্কায়। সেখানে তাঁর মূল মিশন ছিল আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, রিসালাত ও আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদা-বিশ্বাসকে মানুষের মনে দৃঢ়মূল করা। এছাড়া তিনি মানুষকে উন্নত চরিত্র গঠনের আহ্বান এবং গর্বিত কাজ ও আচরণ পরিহারের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। মক্কী যুগে যেসব বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছে তার সাথে তাওহীদের সম্পর্ক ছিল যেমন, পশু-পাখি যবেহ করার সময় এক আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার বিধান। অন্যদিকে মাদানী যুগে একের পর এক শরীয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

অতীত যুগে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের অধিকাংশ প্রচারকগণ জীবদ্দশায় তাদের মতবাদের সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু নবী করীম স. তাঁর জীবদ্দশায় শরীয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন, তা পরিবার, প্রশাসনও মুয়ামিলাত (আদান-প্রদান) ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে ক্ষেত্রের সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا.

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।'[১৭]

দ্বিতীয় স্তর ঃ সাহাবীদের যুগ (عهد الصحابة)

খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ বিভিন্ন নতুন নতুন ঘটনার কারণে নবুওয়তের যুগ থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। অসংখ্য রাজ্য জয়ের ফলে এবং অনারব মুসলমানদের সংস্পর্শে আসায় মুসলমানগণকে বৈচিত্রময় সামাজিক রীতিনীতি ও নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমতাবস্থায় এসব সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহ্র বিধান জানা জরুরি হয়ে পড়ে। কেননা এমন কোন বিষয় নেই যার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা দেয়া সম্ভব নয়। এ যুগে অসংখ্য ফকীহ সাহাবী ছিলেন। যেকোন নতুন সমস্যা বা ঘটনার উদ্ভব হলে সাধারণ মুসলমানগণ সে সম্পর্কে ইসলামের বিধান জানার জন্য তাদের নিকট যেতেন। তাদের মধ্যে অধিক ফতোয়াদানকারী সাহাবীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম, তেরোজনের বেশি নয়। যেমন হযরত উমর, আলী, যায়েদ ইবনে সাবিত, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুআয ইবনে জাবাল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তাদের প্রত্যেকের দেয়া ফতোয়া একত্রে সংকলিত করা হলে এক একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাদের তুলনায় কিছুটা কম সংখ্যক ফতোয়া দানকারী সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ বকর রা.। তাঁর ফতোয়া প্রদানের পরিমাণ তুলনামূলক কম হওয়ার কারণ এই যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ এর ইনতিকালের পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। হিজরতের ত্রয়োদশ বছরে তিনি ইন্তেকাল করেন। এছাড়া তিনি মুরতাদদের (ধর্মত্যাগী) বিশৃংখলা দমন, যাকাত

অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রোম (বাইজান্টাইন) ও পারস্যে যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। এ স্তরের অন্যান্য সাহাবীগণ হলেন, হযরত উসমান, আবু মূসা আল-আশআরী প্রমুখ। তাঁদের প্রদত্ত ফতোয়াগুলো একত্র করা হলে তাতে পুস্তকের এক-দুটি খণ্ড হয়ে যাবে।

কোন কোন সাহাবী শরীয়তের মূলনীতির আলোকে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে একটি দু'টি বা তিনটি বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের নেতা ছিলেন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. অতঃপর তাঁর ছাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.।

সাহাবীদের যুগের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ আবূ বকর ও ওমর রা.-এর সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরে ইজমা-শীর্ষক ইসলামী আইনের আরেকটি উৎসের উদ্ভব হয়। পরবর্তীতে ইজমা ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস হিসাবে গণ্য হয়। সে সময় নতুন কোন ঘটনার উদ্ভব হলে সমসাময়িক খলীফা প্রসিদ্ধ ফকীহ সাহাবীদের সামনে তা পেশ করতেন। তাঁরা কোন বিষয়ে একমত হলে তা ইজমা হিসাবে গণ্য হতো এবং পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধাচরণ করা কারো জন্য বৈধ ছিল না। কোন বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। যেমনঃ দাদী (الجدة الصحيحة) একজন হলে এক-ষষ্ঠাংশ এবং একাধিক হলে উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রত্যেকের অংশীদারিত্বের ব্যাপারে ইজমা, মুসলিম পুরুষ কর্তৃক আহলে কিতাব (প্রকৃত ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী) নারীকে বিবাহ করা জায়েয হওয়া সত্ত্বেও কোন মুসলিম নারীকে আহলে কিতাব পুরুষের নিকট বিবাহ দেয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা এবং পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করার ব্যাপারে ফকীহ সাহাবীগণের ইজমা। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে এসব বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত ছিল না।

শায়খাইন (হযরত আবূ বকর ও ওমর রা.)-এর পরবর্তী যুগে কোন বিষয়ে ইজমা দাবি করার জন্য দলীলের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা এ সময় মুজতাহিদ সাহাবীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দূরবর্তী দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। আর ফকীহগণের পক্ষে তখন এতটুকুই বলা সম্ভব ছিল আমি এই মাসআলায় ভিন্ন কিছু জানি না। এ কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইজমার দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী'। এখানে তিনি শায়খাইন-পরবর্তী যুগকে বুঝিয়েছেন।

এ যুগেও পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। রসূলুল্লাহর স. হাদীস, বিভিন্ন মাসআলায় সাহাবীদের প্রদত্ত ফতোয়া একে অন্যের কাছ থেকে শুনে শুনে মুখস্ত রাখতেন। অবশ্য কোন কোন সাহাবী এগুলো স্মরণ রাখার সুবিধার্থে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তা কিতাব আকারে লিখে রাখতেন।

সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর শেষ যুগে তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রা.-কে হত্যার মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যে বিবাদ বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদের সূচনা হয়।

এরপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে হযরত আলী রা. এর আমলে। সে সময় কিছু বিপথগামী দলের আবির্ভাব ঘটে, যারা নিজেদের মতবাদকে বৈধতা দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ স. ও বিশিষ্ট সাহাবীদের নামে মনগড়া বানোয়াট কথা রচনা করে তাকে হাদীসের নামে চালিয়ে দিতো। এরা কখনো সাহাবীদের দলভুক্ত ছিলোনা; বরং এরা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণকারী একটি সুযোগ সন্ধানী দল।

সাহাবীদের যুগে ইসলামী আইন রোমান ও পারস্যের আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এসময় সাহাবায়ে কিরাম রা. বিভিন্ন দেশের আদলে প্রশাসনিক বিভাগ গড়ে তোলেন। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট ইসলামী কাঠামো বা রূপরেখা থেকে সরে গেছেন। এটি ছিল আইনকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহর আলোকে বিন্যস্ত করার প্রক্রিয়া, কখনো সরাসরি, কখনো ইজমার দ্বারা কখনো কিয়াস আবার কখনো ইসতিসলাহ বা সংস্কারের মাধ্যমে হয়েছে। বিজিত দেশসমূহের প্রচলিত কোন প্রথা (উরফ) ইসলামী শরীয়তের মূল বিধানের ও প্রাণসত্তার পরিপন্থী হলে মুসলমানগণ তা সরাসরি বাতিল করে দিতেন।

তৃতীয় স্তর ঃ তাবেঈদের যুগ (طور التابعين)

এ স্তরটি কনিষ্ঠ সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু হয়েছে। তাদের অধিকাংশই কলহ-বিবাদপূর্ণ যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেছেন। এ যুগে মুসলিম বিশ্বে দু'টি চিন্তাগোষ্ঠীর (School of thought) উন্মেষ ঘটেঃ একটি ছিল হিজায বা আরব উপদ্বীপ কেন্দ্রীক এবং অন্যটি ইরাক কেন্দ্রীক। হিজায অঞ্চলে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠের (Text) উপরই নির্ভর করা হতো। সেখানে যুক্তিবাদের আশ্রয় খুব একটা নেয়া হতো না। কেননা এ অঞ্চলে হাদীস বিশারদগণের প্রবল প্রভাব ছিল। এছাড়া এটি ছিল রিসালাতের উৎসভূমি, আনসার ও মুহাজিরগণ এখানেই বেড়ে উঠেছিলেন। এখানকার তাবিয়ীদের নিকট রসূলুল্লাহ স.-এর কোন হাদীস পৌঁছতে মাঝখানে একজনের বেশী রাবীর প্রয়োজন ছিলো না। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই রাবী হতেন সরাসরি রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও একান্ত বিশ্বস্ত। হিজায ভিত্তিক চিন্তাগোষ্ঠীর একটি কেন্দ্র ছিল মদীনা মুনাওয়ারায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রথমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা., তারপর হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব র. ও অন্যান্য তাবিঈগণ। অন্য আরেকটি কেন্দ্র ছিল মক্কা মুকাররামায় যার পুরোভাগে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও ইকরামা র.।

তাবিঈদের যুগে চিন্তা গবেষণার দ্বিতীয় কেন্দ্রটি ছিল ইরাকে, যেখানে ব্যাপকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির আশ্রয় নেয়া হতো। তাদের মতে এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি শেষ পর্যন্ত কিয়াস-শীর্ষক মূলনীতির আওতাভুক্ত হয়। আর কিয়াস শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ অনুমান করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, সমন্বয় করা, যুক্ত করা ইত্যাদি। ফিকহ্ শাস্ত্রে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নাম কিয়াস। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Analogy। যে বিষয় সম্পর্কিত বিধান কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে নেই সে বিষয়কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় বর্ণিত কোন বিষয়ের হুকুমের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মিলিয়ে বিধান উদ্ভাবনের নাম কিয়াস। উদাহরণ হচ্ছে ঃ হযরত আলী রা. মদ্যপায়ীর শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, সে যখন মদ্যপান করে তখন তার নেশা হয়, যখন নেশা হয় তখন অনর্থক বকাবকি করে, যখন অনর্থক বকাবকি করে তখন মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাই তিনি মদ্যপান করাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়ার উপর অনুমান করে তার শাস্তি আশি ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।

এই চিন্তাগোষ্ঠীভুক্তগণ কিয়াসের উপর বেশী জোর দেয়ার কারণ হলো, তাদের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ হাদীসের রিওয়ায়েতসমূহ গ্রহণে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তার কারণ এই যে, তখন ইরাক ছিল বিভেদ-বিশৃঙ্খলায় ভরপুর। সে সময় ইরাকে উদ্ভূত চরমপন্থী ও বিপথগামী দলের মধ্যে ছিল এক গুজবী

গোষ্ঠী যারা ইসলাম বিদ্বেষকে অন্তরে গোপন রেখে কাজ করতো। দুই-মুলাহিদ-ধর্মদ্রোহী নাস্তিক যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে নানা প্রকার সন্দেহ ছড়াতো। তিন-রাফেজী (শীয়া) চরমপন্থী সম্প্রদায়, এরা হযরত আলী রা. কে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার ছদ্মাবরণে তাঁকে ইলাহ্ বা তাঁর সমকক্ষ মনে করতো। চার-খারেজি সম্প্রদায়, এরা আলী রা. ও তার অনুসারীদের ঘৃণা করতো, এমনকি তারা নিজেদের দলের বাইরের অন্যান্য মুসলমানদের হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হতো না। তাই এ অঞ্চলের ফকীহগণ কোন হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করতেন এবং সেক্ষেত্রে এমন কিছু শর্তারোপ করতেন, যা হিজাযের (মদীনা) বিশেষজ্ঞ আলেমগণ করেননি। কারণ তারা সাহাবী বা তাবিঈর কর্মকান্ডকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করতেন। তবে হাদীসের মধ্যকার বিকৃত অংশ বাদ দিতেন। তারা মনে করতেন সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতটি মানসূখ (রহিত) অথবা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অনুরূপভাবে তারা মনে করতেন রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে রাবীর বিশ্বস্ততা বিভিন্ন কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তাই তারা ত্রুটির কারণে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়াতকে মানসূখ অথবা বর্ণনাকারীর অনিচ্ছাকৃত ভুল হিসাবে গণ্য করেছেন এবং মিথ্যার আশঙ্কার কারণে সতর্কতার সাথে বিশ্বস্ততার মূল্যায়ন করতেন। কেননা বিশ্বস্ততায় কখনো কখনো বিচ্যুতি কিংবা ভুল হতে পারে।

এসব কারণে এই চিন্তাগোষ্ঠীর ফকীহগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির উপর নির্ভর করতেন। অন্যথায় তাদের কাছে সন্দেহাতীতভাবে কোন হাদীস প্রমাণিত হলে বা তাতে ছোটখাট ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকলেও তারা অবশ্যই (যুক্তিকে বর্জন করে) হাদীসকেই প্রাধান্য দিতেন।

ইরাক ভিত্তিক চিন্তাগোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। তাঁর পরে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে থেকে নেতৃত্বে আসেন হযরত আলকামা র. ইবরাহীম নাখঈ র. প্রমুখ। এই ধরাবাহিকতায় এ চিন্তাগোষ্ঠীর ইমামগণের আবির্ভাব হতে থাকে।

হিজায ভিত্তিক চিন্তাগোষ্ঠীর অর্থ এই নয় যে, তারা শুধু কুরআন হাদীস ভিত্তিক চিন্তাগোষ্ঠী এবং তারা মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মোটেও যুক্তিবাদের আশ্রয় নিতেন না। বাস্তব তাদের মধ্যে ও এমন কিছু ফকীহ ছিলেন যারা মাসআলা উদ্ভাবনে যুক্তিবাদেরও উপর নির্ভর করতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীয়া ইবনে আবদুর রহমান, যিনি রবীয়াতুর রায় (যুক্তিবাদী রবীয়া) অভিধায় খ্যাত। তিনি ছিলেন ইমাম মালেক র. এর ওস্তাদ। তেমনিভাবে ইরাকী ফকীহদের কেউ কেউ যুক্তিবাদকে অপছন্দ করতেন। যেমন আমের ইবনে শারাহীল যিনি, আশ-শাবী নামে খ্যাত ছিলেন।

উল্লেখ্য এ যুগে জ্ঞানের অধিকাংশ জ্ঞানসাধক ছিলেন মাওয়ালী (মুক্তদাস ও তাদের বংশধর)। যেমন মদীনায় হযরত নাফে' ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের মুক্তদাস, মক্কায় হযরত ইকরিমা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মুক্তদাস, কুফায় সাঈদ ইবনে যুবাইর ছিলেন বনী ওয়ালিবার মুক্তদাস। এছাড়া বসরার হাসান আল-বসরী, ইবনে সীরীন, সিরিয়ার মাকহুল ইবনে আব্দুল্লাহ, মিসরের ইমাম লাইছ ইবনে সা'দ-এর শিক্ষক ইয়াজীদ ইবনে আবী হাবীবসহ আরো অনেক ফকীহ ছিলেন মাওয়ালী।

এ সময় কিছু খাঁটি আরব ছিলেন যারা জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যেমন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আমের আশ-শাবী, ইবনে কায়েস প্রমুখ। কোন কোন অঞ্চলে তখন জ্ঞান চর্চার আধিক্য লক্ষ করা গেছে।

যেমন মদীনা, কুফা, মক্কা, বসরা, সিরিয়া ও মিসর। এসব অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ পরস্পর জ্ঞান আদান প্রদান করতেন।

তাবিঈদের যুগে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মাওয়ালীগণ বিশেষভাবে অগ্রসর হয়ে যান। এর কয়েকটি কারণ হলো ঃ

(ক) সেকালে আরবরা ছিল অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান। এছাড়া তারা ছিল ইসলামের উৎস। এ ব্যাপারে তারা আত্মশ্লাগা অনুভব করতো, যার ফলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মনোযোগী হতে পারেনি।

(খ) উল্লেখিত মাওয়ালীগণ একটি নির্ঝঞ্ঝাট সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। ফলে তারা দীনের প্রচার প্রসারেরও গবেষণায় আত্মনিবেদন করেছিলেন।যেহেতু তারা সামরিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত ছিলেন না, তাই কলমের মাধ্যমে ইসলামের সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

(গ) নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ অন্যান্য মাওয়ালীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যাতে তারা জ্ঞানের আমানত বহনের যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। যেমন হযরত নাফে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের মুক্তদাস। তাঁকে হযরত আবু হুরায়রা রা. ও উম্মে সালামা রা.-সহ আরো অনেক সাহাবী শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে ইবনে ওমর বলেছেন, لقد من الله علينا بنافع 'আল্লাহ নাফে এর দ্বারা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' ইকরিমা ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মুক্তদাস। ইবনে আব্বাসের মৃত্যুর সময় ইকরিমা তাঁর দাসত্বে ছিলেন। অতঃপর আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে খালিদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মুআবিয়ার নিকট চার হাজার দিনারে বিক্রি করেন। তখন ইকরিমা আলীকে বললেন, আপনি আপনার উম্মতের জ্ঞানকে চার হাজার দীনারে বিক্রি করে দিলেন? একথা শুনে আলী রা. খালিদ রা.-কে বিক্রয় চুক্তি রদ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সেমতে খালিদ রা. চুক্তি প্রত্যাহার করেন এবং আলী রা. তাঁকে দাসত্ব মুক্ত করেন।

হাসান বসরী র. মাওয়ালী ও তাবেঈদের ইমাম ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার রা. ঘরে বড়ো হয়েছেন। তাঁর মর্যাদা নির্দেশের জন্য এতটুকু উল্লেখই যথেষ্ট।

(ঘ) এসব মাওয়ালী প্রবীন ও প্রাজ্ঞ সাহাবীগণের সার্বক্ষণিক সাহচর্যে থাকতেন। এ কারণে তারা ঐসব সাহাবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন। এসব বিষয়ই তারা পরবর্তী উম্মতের জন্য বর্ণনা করে রেখে গেছেন।

পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ না হওয়ার দিক থেকে এ যুগটি মোটামুটি প্রবীণ সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি এ যুগে এমন কোন ফকীহ-এর সন্ধান পাওয়া যায়নি, যিনি শরীয়তের পরিচিত উৎসগুলোর বাইরে এসে কোন বিধানের ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন। যদি তাই হতো তবে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টিকারীগণ অবশ্যই এমন একটি বিধানের প্রমান দিতেন, যার কোন শরয়ী ভিত্তি নেই।

উরফ (প্রথা) ভিত্তিক মাসআলাসমূহ শরয়ী মানদন্ডের অধীন। ইসলাম যদি কোন উরফকে রদ বা বাতিল করে দেয় তবে তার কোন মূল্য নেই এবং সেটি গ্রহণ করা ভ্রষ্টতা। আর কোন উরফকে ইসলাম গ্রহণযোগ্য মনে

করে বহাল রেখে থাকলে তা উরফ হওয়ার কারণে নয় বরং কুরআন সুন্নাহর মানদন্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে দাসী। কোন উরফ সম্পর্কে শরীয়ত নীরব থাকলে মাসলাহা (জনকল্যাণ) এর বিবেচনায় তা গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

ঐ যুগে মারাত্মক আকারে বিবাদ বিশৃংখলা বিরাজিত ছিল। তবে এসব বিবাদ-বিশৃংখলা ও তার প্রতিক্রিয়া খিলাফত সংশ্লিষ্ট বিষয় ও বিধিবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এ যুগটি ছিল উমাইয়া খিলাফতের যুগ। এই বংশের খলীফাগণ তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় কখনো নমনীয়তা কখনো কঠোরতা এবং কখনো মধ্যমপন্থা ইত্যাদি বিপরীতধর্মী নীতি অবলম্বন করতেন। তবে তাদের কেউ-ই বেপরোয়াভাবে কুফরীতে লিপ্ত হতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তাদের কেউ এ ধরনের কিছু করলে সাথে সাথে তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা হতো। এযুগের ফকীহগণ পরস্পর মত বিনিময় করতেন আলোচনা পর্যালোচনা ও তর্ক বিতর্ক করতেন এবং সত্যকে গ্রহণ করার স্বার্থে পরস্পরের অভিমত মেনে নিতেন। রসূলুল্লাহ স. এ যুগকে উত্তম যুগ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

"সর্বোত্তম মানুষের যুগ হলো আমার যুগ, অতঃপর যারা তাদের পর আসবে অতঃপর যারা তাদের পর আসবে"।[১৮]

চতুর্থ স্তর ঃ কনিষ্ঠ তাবেঈন ও প্রবীন তাবে-তাবেঈনের যুগ

এ স্তরটি হিজরী প্রথম শতাব্দীর সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শুরু হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, খলীফা হযরত উমর ইবন আবদুল আযীযের শাসনামলই এযুগের সূচনা বিন্দু। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব স্তরের তারিখ ভিত্তিক কোন সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এক যুগের সাথে পরবর্তী যুগ সংশ্লিষ্ট বা সংযুক্ত।

এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে সময় রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. ও তাবেঈদের ফতোয়া (ব্যক্তি অভিমত) যৌথভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ হয়। আর এটি হয়েছিল আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর নির্দেশে। কারণ তিনি আংশকা করেছিলেন যে, কালের পরিক্রমায় রসূলুল্লাহর স. সুন্নাহ এবং সাহাবী ও তাবেঈদের অভিমতসমূহ হারিয়ে যেতে পারে। কুরআন মজীদের সাথে মানবীয় বক্তব্যের মিশ্রণ ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ার পরই হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য লিখে রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়। সে সময় কুরআন লিখিত আকারে ও স্মৃতিতে উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, হাজার হাজার হাফেজে কুরআন তৈরি হয়েছিল এবং এমন কোন মুসলিম ঘর পাওয়া যেতোনা যেখানে এক কপি কুরআন ছিল না। তাই খলীফা তাঁর যুগের জ্ঞানীদেরকে তাদের সংগ্রহে থাকা হাদীস, সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতোয়াসমূহ সংকলনের নির্দেশ দেন।যাতে সেগুলো তথ্যসূত্র হতে পারে এবং ইসলামী সমাজে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধানে মুজতাহিদদের জন্য নমুনা হতে পারে। কতিপয় প্রাচ্যবিদের (Oreantalist) মতে, হাদীসের সংকলন ছিল কিছু ফিকহী মতামতকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে।কথাটি

এখানে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, ফিকহী মতামত ও সুন্নাহ একই সময়ে সংকলন করা হয়েছিল।

এ যুগে আলেমগণ তাদের কর্মপদ্ধতি ও ইলমি ঝোঁক প্রবণতার দিক থেকে বিশেষত্ব অর্জন করা শুরু করেন। তন্মধ্যে কেউ ভাষা সংকলনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, কেউ সেই ভাষার সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, আবার কারো ঝোঁক ছিল আকীদা সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার বিষয় নিয়ে কাজ করার প্রতি। যেমন যুক্তিবাদীদের (عقليين) প্রশংসা ও ঘৃণা করা, আল্লাহকে দেখা ইত্যাদি। আমরা দেখতে পাই এ যুগের ফকীহগণ কুরআন সুন্নাহ থেকে শরয়ী বিধি-বিধান উদ্ভাবনে সহায়ক আরবী ভাষায় এ পরিমান দক্ষতার পাশাপাশি তারা হাদীসের বাহক ও মুফাসসিরে কুরআন হিসাবেও গণ্য হতেন। তাই এযুগে ফকীহদের উচ্চ মর্যাদা ছিল। শাসকরা তাদেরকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করতেন। তদ্রুপ জনসাধারণও রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে তাদের অবস্থানের দিকে না তাকিয়েই তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিতেন, সমস্যা সমাধানে তাঁদের নিকট আসতেন এবং তাদেরকে এই উম্মতের প্রদীপ হিসাবে গণ্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা তাদের মধ্য হতে উল্লেখ করছি। ইমাম জুহরী, হাম্মাদ বিন সালামা ও আবু হানিফার এর নাম।

এ যুগের শেষ দিকে স্বতন্ত্র ফিকহী মাযহাবের আত্মপ্রকাশ শুরু হয়। তদ্রুপ এ যুগটি সংকলনের ক্ষেত্রে উন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করে। বিশৃঙ্খলভাবে সংকলনের পর এসময় এসে তা একটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে। এ স্তর ছিল পঞ্চম স্তর অর্থাৎ বড় বড় ইমামদের স্তরের সূচনা।

পঞ্চম স্তর ঃ ইজতিহাদের যুগ (طور الاجتهاد)

ইসলামী সাম্রাজ্যে ব্যাপক ইলমী জাগরণের মধ্য দিয়ে এ যুগের সূচনা হয়। তা ছিল উমাইয়া খিলাফতের শেষদিক হতে প্রায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। যেমনটি আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে, সুনির্দিষ্ট দিন ক্ষণের আলোকে এসবের শুরু এবং শেষ উল্লেখ করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বড় বড় ইমাম, বিভিন্ন মাযহাবের মুজতাহিদ ও আহলুত তারজীহদের (অগ্রাধিকার দানকারী) যুগ এ স্তরের অন্তর্গত। তদ্রুপ সূক্ষ্ম ইলমী পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফিকহী মাযহাবের সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের যুগও এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্যকরণ এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট করা উচিত যে, এ যুগটি নতুন একটি জ্ঞান উৎপত্তির সাক্ষ্য বহন করে, যার সাথে ফিকহের মজবুত সম্পর্ক রয়েছে। আর তা হচ্ছে ইলমু উসূলিল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি শাস্ত্র)। চলবে......

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা হূদ, আয়াত ঃ ৯১

২. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৪৪

৩. সূরা আল-আনআম, আয়াত : ৯৯

৪. সূরা লোকমান, আয়াত : ১১

৫. সূরা ফাতেহা / ৪

৬. সূরা সাফ্ফাত / ৫৩

৭. সূরা আনফাল / ৩৯

৮. সূরা কাফিরুন / ৬

৯. সূরা তাওবা / ২৯

১০. সূরা শূরা / ১৩

১১. সূরা জাছিয়া / ১৮

১২. সূরা মায়েদা, আয়াত : ৪৮

১৩. সূরা আনআম / ৫৭

১৪. সূরা নাহল, আয়াত : ১১৬-১১৭

১৫. সূরা মাইদা, আয়াত : ৬৭

১৬. সূরা নাহল, আয়াত : ৪৪

১৭. সূরা মাইদা / ৩

১৮. হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে শায়খাইন বর্ণনা করেছেন।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩-৭৮

মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী

আরবের মরু প্রান্তর যখন লাত মানাতের স্তুতিগানে মুখরিত, অন্যায় অবিচার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে যখন আরবের দিক দিগন্তের চক্রবাল মসিলিপ্ত-আরব বিশ্ব যখন অভাব অনটনের চরম কষাঘাতে জর্জরিত, মূর্খতা, বর্বরতা, খুন-খারাবী, মদ পান, জুয়া লেখা, ব্যভিচার নারী নির্যাতন, শিশুহত্যা, দাসত্ব প্রথা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি, মজুদদারী, কালোবাজারী, শোষন ও জুলুম-নির্যাতনের নারকীয় তান্ডব যখন ছেয়ে ফেলেছিল গোটা আরব বিশ্বকে। পশু পালন, পশু শিকার দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদভিত্তিক ব্যবসাই ছিল যখন তাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, যখন জোর যার মুল্লুক তার এটাই ছিল তাদের অর্থনৈতিক দর্শন, বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো যখন ছিল অবলুপ্তির পথে, বিশ্বমানবতার করুণ আর্তনাদে যখন মুখরিত হচ্ছিল গোটা আরব তথা সমগ্র বিশ্বের আকাশ-বাতাস ঠিক এমনি এক সন্ধিক্ষণে অভ্যুদয় হলো আরব বিশ্বের আকাশে সুবহে সাদিকের রঙ্গিণ আলোকবর্তিকা। নবুওয়তের রাজমুকুট মাথায় পরে শান্তির স্বর্গীয় বার্তা সাথে বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা মুহাম্মাদ স. সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, অধিকার বঞ্চিত দারিদ্র্য জর্জরিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মুক্তির দূত বিশ্বের সকল দিক ও বিভাগের সংস্কার আন্দোলনের অগ্রনেতা পৃথিবীতে আগমন করেন।

ধন-বন্টন, যাকাত ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাদকাহ, ফিতরা, খারাজ প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন, অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়কে নিষিদ্ধ করা, বল্গাহীন অবাধ ব্যক্তিমালিকানা, সুদ, জুয়া, লটারী, ঘুষ, চুরি, রাহাজানি, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, একচেটিয়া মজুদদারি, গুদামজাতকরণ, ভেজাল, শোষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে তিনি ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনে আনলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জাহেল যুগের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে তিনি সেখানে এমন এক অর্থনেতিক ব্যবস্থা কায়েম করলেন, যেখানে যাকাত গ্রহণ করার মত কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না।

মহানবী স. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নীতিমালা পেশ করেছেন তা সর্বযুগের সর্বকালের সর্বস্থানের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চিত গ্যারান্টি। আমাদের দেশসহ বর্তমানে সারা বিশ্বে যে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাী অর্থ ব্যবস্থার প্রচলিত, যার মাধ্যমে মানুষ চরমভাবে নির্যাতিত ও শাসিত, তা থেকে

লেখক ঃ প্রফেসর, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মুক্তি পেতে হলে কোন মানব রচিত মতবাদ নয় বরং সকলকে মহানবী স. এর উপস্থাপিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে।

ব্যবসা বাণিজ্য

এ পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে ব্যবসা হচ্ছে সবচাইতে বড় জীবন উপকরণ। অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যতবেশী মনযোগ দেয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতি তত বেশী স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে। ব্যবসা বাণিজ্যে দুর্বলতার কারণে এক জাতি অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং এ পথ ধরেই এক জাতি অন্যের তাহযীব, তমদ্দুন, জীবনোপকরণ, রাজনীতি এমনকি ধর্মীয় অধিকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে এবং তাদেরকে দাসে পরিণত করে। একচ্ছত্র শাসন কায়েম করে।

ব্যবসা ঃ تجارت তিজারত

পবিত্র কুরআনে নয়টি আয়াতে তিজারত শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম রাগেবের ব্যাখ্যায় এর অর্থ হচ্ছে 'মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে মূলধন বিনিয়োগ ও ব্যবহার করা।'[২]

التصرف فى راس المال طلبا للربح

কুরআনে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে যে আয়াতটি ব্যবহৃত হয়েছে -

إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم

তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।, সূরা নেসা-২৯ এ আয়াতে যে তিজারত শব্দ ব্যবহার হয়েছে তার ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেন-

اتجارة هى البيع واشراء وا لتجارة فى اللغة عبارة عن المعاوضت

তিজারত বা ব্যবসা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে তিজারাত গড়ে ওঠে বিনিময় থেকে। প্রত্যেক বিনিময় কাজই মূলত তিজারত, সে বিনিময় যে কোন ধরনেরই হোক।[৩]

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

أُولئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُاالضَّلَلَةَ بِالْهُدَى فَمَارَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ.

'ঐ সব লোক যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে, বস্তুত তারা তাদের ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেনি আর তারা হেদায়াতও লাভ করতে পারেনি।'[৪]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, ক্রয় বিক্রয় সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হবে।[৫]

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন অনেক পুরনো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের পদ্ধতি ও মাধ্যমে পরিবর্তন আসে। রসূলুল্লাহ্ স. নবুয়তের পূর্বে তাঁর চাচার সাথে ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করেন। ব্যবসা উপলক্ষ্যে তিনি একবার তাঁর চাচার সাথে সিরিয়ায় যাত্রা করেন। পথে বহিরা রাহীব নামক এক খৃষ্টান প্রাদ্রীর পরামর্শে চাচা তাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। খাদীজা রা. আরবের সম্ভ্রান্ত ধনী মহিলা ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ স.-কে তার ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।[৬] নবুয়তের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রচুর গণিমতের মাল অর্জিত হওয়ায় রসূলসহ সকল সাহাবাদের স্বচ্ছলতা বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "আমার বর্শার ছায়ার নীচে আমার রিযিক।[৭]

সাহাবীদের মধ্যে অধিকাংশ মুহাজির ছিলেন ব্যবসায়ী। আবু বকর রা. রসূলের যুগে বসরাতে ব্যবসার উদ্দেশ্য গমণ করেন। খলিফা হওয়ার পর সকাল বেলা কাপড়ের বোঝা নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে উমর রা. ও আবু উবায়দাহ্ ইবনুল জাবরাহ এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারা বললেন, আবু বকর, আপনি এ কি করছেন? আপনার উপর মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বললেন فمن اين أطعم عيالى আমি কোথা থেকে পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করব? তারা বললেন, আমরা আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করব। অতঃপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হলো। তেমনি ওসমান, উমর, আব্দুর রহমান রা. ব্যবসার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন। তারা তাদের ব্যবসার অধিকাংশ মুনাফা আল্লাহর পথে জিহাদে দান করেছেন। রসূল মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের ভরণ পোষণের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন আব্দুর রহমান।[৮] ইবনে খালদুন (৭৮৯ হিঃ) তার মোকাদ্দামায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক পণ্য ক্রয়, উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশে বিক্রি, আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। ইবনে খালদুনের লিখার উপর ভিত্তি করে তার পাঁচশ বছর পর ১৭৭৬ খৃঃ আদম স্মিথ, ডেভিড রিয়ার্ড, হেলীন সাধারণ ব্যয়, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ব্যবসার আধুনিক দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।[৯]

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যবসার গুরুত্ব

ইসলাম সর্বদা হালাল পথে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন,

واذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وا بتغوا من فضل الله

'নামায সমাপ্ত হলে, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।'[১০]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে বাহার আল-হালানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলের সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে বাসার আল-মাযনীকে দেখেছি জুমার নামাযের পর তিনি বের হয়ে কিছু সময়ের জন্য বাজারে ঘুরে এলেন, অতঃপর পুনরায় মসজিদে ফিরে এসে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ইচ্ছেমত নামায পড়লেন। তখন তাকে বলা হলো, আপনি এ এরকম কেন করলেন? তিনি বললেন, আমি রসূল স.-কে এ রকম করতে দেখেছি। তারপর তিনি কুরআনের উল্লেখিত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।[১১]

ওয়ালীদ ইবনে রিবা থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা রা. লোকদের সাথে জুমার নামায পড়ছিলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি চিৎকার দিয়ে উক্ত আয়াত পড়লেন। এতে মানুষ মসজিদের দরজায় জড়ো হয়ে গেল।[১২] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রসূল স. বলেছেন, যে আমদানীকারক এক মুসলিম দেশ থেকে অন্য মুসলিম দেশে খাদ্য আমদানী করে আর তা সে নিজে বাজার মূল্যে বিক্রি করে তার মর্যাদা শহীদদের সমতুল্য। অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১৩] আল্লাহ তায়ালা সমুদ্র পথে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর কল্যাণ ও উপকারিতার দিক বিভিন্নভাবে সাধারণ লোকদের সামনে পেশ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী সমুদ্র পথে বাণিজ্য সম্পর্কিত অধ্যায় নামে একটি আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه–

'তোমরা দেখ সমুদ্রের বুক চিরে জাহাজগুলো চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো।'[১৪]

হাদীসের আলোকে ব্যবসার গুরুত্ব

ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেছে এবং ব্যবসার মাধ্যমে ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ব্যবসার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

عن ابى سعيد الخد رى عن النبى صلى التاجر الامين مع النبين والصد يقين والشهداء–

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বীয়া সিদ্দীক ও শহীদ প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।[১৫]

عن ابى بردة قال سئل رسول الله اى الكسب طيب وافضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور–

আবু বুরদা রা., থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ স.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কোন ধরনের উপার্জন উত্তম ও পছন্দনীয়। তিনি বললেন ব্যক্তির নিজ হাতে কাজ করা এবং ব্যবসায়ে সত্যনিষ্ঠা।[১৬]

عن رافع بن رافع ان النبى صلى قال ان التجار يبعثون يوم القيا مة فجا را الامن اتقى الله وبروصدق–

রাফে ইবনে রাফে থেকে বর্ণিত। নবী করিম স. বলেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসেক বা পাপাচারীরূপে উঠানো হবে, কিন্তু যে সব ব্যবসায়ী আল্লাহকে ভয় করেছে, সঠিক পন্থায় কাজ করেছে এবং সততা অবলম্বন করেছে তারা এর ব্যতিক্রম।[১৭]

تسعة اعشار الرزق فى التجارة

নবী করিম স. বলেছেন, রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে।[১৮]

মুসলিম ব্যবসায়ীদের সততা ও আমানতদারী এক সময় দেশে দেশে ইসলামী দাওয়াত পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছে। মালয়-উপদ্বীপ, ফিলিপাইন ছাড়া, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ভারত থেকে চীন পর্যন্ত মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে।

ব্যবসায়ের মূলনীতি

ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যবসায়ীকে অবশ্যই এ নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

১. পারস্পরিক সহযোগিতা

ব্যবসা বাণিজ্যের বৈধতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত আর এ জন্য ব্যবসায়িক ব্যাপারে উভয় পক্ষের সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

'নেক ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে কাউকে সাহায্য করো না।'[১৯]

ক্রয় বিক্রয় যদি আল্লাহর নাফরমানীর কোন কাজে সাহায্যকারী হয় অথবা কোন হারাম কাজের সৃষ্টি করে তাহলে সে ক্রয় বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

ان اللّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير-

নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলুল্লাহ্ স. মদ, মৃত প্রাণী ও শূকর বিক্রয় করা হারাম করেছেন।[২০]

২. হালাল পথে ব্যবসা করা

ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ইসলাম সর্বদা হালাল পথে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে। অবৈধ পথে উপার্জন করতে নিষেধ করেছে।

আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ-

হে ঈমানদারগণ তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পর পরস্পরের ধন সম্পদ ভক্ষণ করো না।[২১]

রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতার ভরণ পোষণের জন্য হালাল পথে ব্যবসা করার নিমিত্তে পৃথিবীতে বের হয় সে আল্লাহর পথে বের হয়। যে ব্যক্তি হালাল পথে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বের হয় সে আল্লাহর পথে বের হয়। যে ব্যক্তি নিজের ভরণ পোষণের জন্য বের হয় সেও আল্লাহর পথে বের হয়। আর যে ব্যক্তি সম্পদের প্রতিযোগিতার জন্য বের হয় সে শয়তানের পথে বের হয়।[২২]

৩. রসূলুল্লাহ স. বলেন, كسب الحلال فريضة بعد الفريضة
হালাল রুজী উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য।
৪. ব্যবসা বাণিজ্যে কোন প্রকার প্রতারণা, ক্ষতি ও আত্মসাৎ করা যাবে না। রসূলুল্লাহ স. সে বলেন,

عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى نهى عن بيع الغرر

সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য নিষেধ করেছেন।[২৪]
তেমনি রসূলুল্লাহ স. ব্যবসা বাণিজ্যে কসম করা সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।

ايا كم وكثرة الحلف فى البيع فإ نه ينفق ثم يمحق-

'তোমরা ক্রয় বিক্রয়ের কাজে বেশী বেশী শপথ করা থেকে দূরে থাক; কেননা তা মানুষকে মুনাফিক বানায় এবং আমলকে নিস্ফল ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়।' ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মুনাফা করবে এটা স্বাভাবিক ইসলাম তা নিষেধ করে না। তার মুনাফা পাওয়ার অধিকার না থাকলে কেউ ব্যবসা করবে না।
তবে ربح الفاحش সীমাহীন মুনাফা Excessive and exhorbiant profit গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা তা এক ধরনের শোষণ ও জুলুম। শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ মুনাফা হচ্ছে ব্যবসায় ক্রয় মূল্যের এক ষষ্ঠাংশের নিম্নে মুনাফা করবে।।
পণ্য মূল্য জানেনা এমন ক্রয়কারীর নিকট থেকে বেশী মূল্য আদায় করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ফকীহগণের দৃষ্টিতে তা ধোকা প্রতারণা। যারা একাজ করে তাদেরকে 'মুস্তারসিল' বা অতি মুনাফাখোর বলে হাদীসে নিন্দা করা হয়েছে।

ايما مسلم استرسل الى مسلم فنبه فى البيع فهو اثم-

যে মুসলিমই অপর মুসলিমের নিকট থেকে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নিল সে তাকে প্রতারিত করল এবং সে বড়ই অপরাধী।[২৬]

৫. ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা ও আমানতদারী রক্ষা করা

ব্যবসা বাণিজ্যে সততা ও আমানতদারী রক্ষা করতে হবে। প্রথম যুগের মুসলিম ব্যবসায়ীগণ সততা ও আমানতদারী রক্ষা করার কারণে ব্যবসার মাধ্যমে দেশে দেশে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া সহজ হয়ে ছিলো।[২৭]

عن حكيم بن حزام عن النبى صلى قال البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى يعهما وان كتما وكذبا لحقت بركة بيعهما-

হাকীম বিন হিযাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে। যদি উভয়েই সততা ও স্বচ্ছতার সাথে ক্রয় বিক্রয় করে এবং কোনরূপ লোকুচুরি ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করে তবে উভয়ের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত হবে। আর উভয়ে যদি মিথ্যা ও লোকুচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে তবে বরকত বিনিষ্ট হয়ে যাবে।[২৮]

রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ انما البيع عن تراض। ক্রয় বিক্রয় সম্মতি ও সম্মতির ভিত্তিতে হবে।[২৯]

অন্যত্র রসূলুল্লাহ স. বলেন, সেই ব্যবসায়ীর উপার্জন সর্বাধিক উত্তম উৎকৃষ্ট ও পবিত্র যে মিথ্যা কথা বলেনা, ওয়াদা খেলাফ করেনা, আমানতের খেয়ানত করে না। ক্রয় বিক্রয় করার সময় অযথা মন্দ বলেনা। বিক্রয় করার সময় পণ্য দ্রব্যের মিথ্যা প্রশংসা করে না। আর কারও পাওনা হলে তা দিতে বিলম্ব করে না। আর কারও নিকট তাদের পাওনা থাকলে দেনাদারকে ভর্ৎসনা করে না, লজ্জা দেয় না।[৩০]

হযরত আবু বকর রা. কখনও কোন কাপড়ে ত্রুটি দেখলে সেটা খরিদদারকে জানাতেন এবং সে মালটি উপরে রাখতেন।[৩১]

ইমাম আবু হানিফ রা. একজন দক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সব সময় যে কাপড়ে কোন ত্রুটি থাকত সেটি উপরে রাখতেন, যাতে করে ক্রেতা দেখতে পায়। একবার তিনি তার প্রতিনিধিকে কাপড় বিক্রি করার জন্য বাজারে পাঠান। সেই চালানে কিছু পরিমাণ কাপড় ত্রুটিযুক্ত ছিল। তিনি প্রতিনিধিকে বললেন, ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের বিষয়টি অবশ্যই ক্রেতাকে জানাবে। কাপড় বিক্রি করার পর প্রতিনিধি ফিরে এলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ত্রুটিযুক্ত কাপড় কি করেছ? প্রতিনিধি উত্তর দিলো, আমি ক্রেতাকে ত্রুটির কথা জানাতে ভুলে গিয়েছি। এ কথা শুনে আবু হানিফা ক্রেতার বাড়ী গিয়ে ক্রেতাকে ত্রুটিযুক্ত কাপড়ের মূল্য ফেরত দেন।[৩২]

৬. ব্যবসা শুধু সম্পদ অর্জন নয় তাতে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এক্ষেত্রে উসমান রা. ছিলেন একজন আদর্শ ব্যবসায়ী।

ক) মদীনায় সব সময় খাদ্য শস্যের অভাব ছিল। একবার উসমান রা. এর ব্যবসায়ী কাফেলা বাজারে গম নিয়ে এলো। তারা উসমান রা.কে তা বেশী দামে বিক্রি করার জন্য পরামর্শ দিল। কিন্তু উসমান রা. তাদের কথা শুনেননি, বরং তিনি মূল্য ছাড়াই মদীনাবাসীদের মাঝে সকল গম বন্টন করে দিলেন। তিনি বললেন, আমি এ গম আল্লাহর নিকট দশগুণ দামে বিক্রি করেছি।

খ) মদীনার পাশে একটি পানির কূপ ছিল, এর মালিক ছিল এক ইহুদী। এক সময় আশে পাশের লোকদের পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়। তখন নবী করিম স. বললেন, রুমা কূপ খরিদ করার মত কে আছো? এর এক বালতি পানির বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতে সেই পরিমাণ পানি দিবেন। একথা শুনে উসমান রা. তা ক্রয় করার জন্য রাযী হলেন, কিন্তু ইহুদী উচ্চমূল্য দাবী করল। উসমান রা. ছিলেন পারদর্শী ব্যবসায়ী।[৩৩] তিনি প্রস্তাব দিলেন, আমি কূপের পানি অর্ধেক খরিদ করব। অর্থাৎ একদিন আমি পানি ব্যবহার করব, অন্যদিন ইহুদী ব্যবহার করবে। জনগণ মূল্য দিয়ে পানি ক্রয় করে নিবে। উভয়েই একথায় রাযী হলো। উসমান রা. কোন

মূল্য ছাড়াই তার পানি বন্টন করলেন, মানুষ পানি নিয়ে পরবর্তী দিন রেখে দিত। আর যে দিন ইহুদীর পালা আসতো কেউ পানি ক্রয় করতো না। এভাবে পানি কেনার পরিমাণ কমতে লাগলো। নিরূপায় হয়ে ইহুদী বাকী অর্ধেক অল্প মূল্যে উসমানের রা. কাছে বিক্রি করে দিল। এভাবে উসমান রা. তার ব্যবসার অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।

৭. অবৈধ পন্থায় সম্পদ বাড়ানো

ইসলাম অবৈধ পন্থায় সম্পদ বাড়ানোকে সমর্থন করে না। ইসলাম সামাজিক কল্যাণ ও জনকল্যাণকে ব্যক্তিগত কল্যাণের উর্ধ্বে স্থান দেয়। ব্যবসা বাণিজ্যে অর্জিত সম্পদ শুধু নিজের প্রয়োজনে নয় সমাজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। রাসূল সা. বলেন,

مامن مسلم يغرس غرسا اويزرع زرعا فياكل منه طيراوانسان او بهيمة الا كان له صدقة

'কোন মুসলমান যদি গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা পাখি মানুষ অথবা চুতষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দানস্বরূপ গণ্য হবে। (অর্থাৎ সে দানের সওয়াব পাবে)[৩৪]

অন্যত্র রাসূল স. বলেন, خيرالناس انفعهم للناس

'উত্তম মানুষ হলো যে মানুষের উপকারে কাজ করে।'[৩৫]

মুনাফাখোরী ও ধোঁকাবাজী

রাসূল স. ব্যবসা ক্ষেত্রে মুনাফাখোরী ও ধোঁকাবাজির হাত থেকে প্রথম বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছেন। হিজরতের পর মদীনায় গিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ব্যবসার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হলো একটি সুন্দর সমাজের ভিত্তি। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে ও সম্পদ অর্জনে মানুষের বিবেক ও অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহভীতি ও আমানতদারীর প্রতি গুরুত্ব দেন। তখন বনু কায়নুকার এলাকায় ছিল মদীনার একমাত্র বাজার। ইহুদীগণ সেখানে একচেটিয়া ব্যবসা করত। তারা সেখানে মজুদদারী মুনাফাখোরী, ধোকাবাজী ও সুদের মাধ্যমে মদীনার সকল ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। রাসূল স. সেখানে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর ব্যবস্থা করেন। তিনি মদীনার বিভিন্ন স্থানে ঘোড়া, উট, বকরী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বেচাকেনার জন্য বেশ কিছু বাজার সৃষ্টি করেন। এসব বাজারে স্বাধীনভাবে সকল মানুষের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এবং মুনাফাখোরী ও ধোঁকা প্রতারণার যাবতীয় ব্যবসা বন্ধ করেন।[৩৬] রাসূল স. স্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যের উপর কৃত্রিমভাবে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করার সাথে সাথে মুনাফাখোরী ও ধোকাবাজী প্রতারণা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। এ কথাটি বোঝানো জন্য হাদীসে النجش। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

عن ابن عمر قال نهى النبى ﷺ عن النجش-

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম স. প্রতারণা, দালালী ও ধোকাবাজী করে মুনাফা থেকে নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন পণ্যের ন্যায্যমূলের অধিক দাম হাঁকানো অথচ তুমি তা ক্রয়ের ইচ্ছে করোনা। কিন্তু তোমার কথাশুনে অন্যরা বেশী দামে ক্রয় করে। সাধারণত অন্যকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়। ইবনে হাযার বলেন, এটিও সূদ খাওয়ার অনুরূপ।[৩৭]

রসূলুল্লাহ স. এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে গ্রাম থেকে যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী শহরে আসত একদল বণিক সেগুলোর খোঁজ খবর নিয়ে পণ্যসামগ্রী বাজারে পৌছার পূর্বেই বিশ-ত্রিশ মাইল এগিয়ে গিয়ে গ্রামীণ মালিকদের নিকট থেকে সে মাল কিনে নিত। অতঃপর নিজের ইচ্ছেমত অধিক মুনাফায় সেগুলো শহরের বাজারে বিক্রি করত। এভাবেই বিভিন্ন শহরে মুনাফাখোরীরা এজেন্ট হয়ে বসত। ফলে কোন মাল বাজারে নিয়ে আসলে ঐ এজেন্টদের মাধ্যমেই বিক্রি করতে বাধ্য হত। এ পদ্ধতির বেচাকেনায় কখনো শহরবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো, আবার কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতো সে সব লোক যারা বহু কষ্টে গ্রাম থেকে পণ্যসামগ্রী নিয়ে শহরে আসতো। রসূলুল্লাহ স., বাণিজ্য কাফেলার আগমন বার্তা শুনে অগ্রগামী হয়ে সস্তায় পণ্যদ্রব্য কিনতে নিষেধ করেছেন। এবং বলেছেন, কোন শহরবাসী যেন পল্লীর অধিবাসীদের পণ্য বিক্রি না করে।[৩৮]

হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এ হাদীসের অর্থ কি? তিনি বললেন, শহরবাসীরা যেন অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য এ ধরনের দালালী না করে।

দালালীর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করার মধ্যে সাধারণভাবে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকলেও কোন কোন সময় এ ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে প্রাচীন যুগে যখন খাদ্যশস্যের মূল্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় তখন মুনাফাখোরী দালালদের খপ্পরে পড়ে অনেক নিরীহ লোকের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। বর্তমানেও যখন কোন মালের চাহিদা বেড়ে যায় তখন মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা এ ধরনের কাজ করে।

২. ব্যবসা-বাণিজ্যে কয়েকটি ভ্রান্ত পদ্ধতি

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন কয়েকটি ভ্রান্ত নীতি প্রচলিত ছিল, রসূলুল্লাহ স. সে সব ব্যবসা অবৈধ ঘোষণা করেছেন;

(ক) মুনাবাসা অর্থাৎ বিক্রেতা তার বস্ত্রখন্ড ক্রেতার দিকে নিক্ষেপ করল আর সংগে সংগে তা বিক্রি হয়ে গেল বলে ধরে নেয়া হলো। অথচ ক্রেতা সেটাকে হাতেও ধরলো না বা চোখেও দেখল না।[৩৯]

(খ) মুলামাসা (অর্থাৎ ক্রেতা কাপড় স্পর্শ করলে সংগে সংগে বিক্রি হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হলো।

(গ) হাবলিল হাবলা (অর্থাৎ ক্রেতা এ শর্তে একটি উটনী কিনে নিল, যখন এর বাচ্চা হবে এবং এ বাচ্চারও বাচ্চা হবে তখন উটনীর মূল্য পরিশোধ করা হবে।[৪০]

(ঘ) বায়য়ুল হাসাত অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, যখন তুমি আমার দিকে কংকর নিক্ষেপ করবে তখন অবশ্যই ধরে নিতে হবে বিক্রয় ও খরিদ সম্পন্ন হয়েছে।

عن ابى هريرة رض الله ان رسول اللّٰه ﷺ نهى عن ملامسة والمنا بذة-

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. মুলামাসা ও মুনাবাযা কেনাবেচা নিষেধ করেছেন।

وعن ابى سعيد قال نهى النبى عن بيعتين ملا مسة المنا بذة-

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম স. মুলামাসা ও মুনাবাযা এ দুরকমের ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৪১]

نافع بن عمران عن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحبلة الحبلة

নাফে বিন ইমরান থেকে বর্ণিত, নবী করিম স. পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[৪২]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغر و بيع الحصاة

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত । রসূল স. প্রতারণামূলক ক্রয় বিক্রয় ও কাঁকর নিক্ষেপ করে ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৪৩] এসব মুনাফাখোরী কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

انما الخمر و الميسر و الازلام رجس من عمل الشيطان

'মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্যবস্তু শয়তানের কাজ।[৪৪] আরবীতে الميسر......القمار। উভয় শব্দের অর্থ জুয়া قمر শব্দের মূল অর্থ হলো চাঁদ। যেহেতু চাঁদ বাড়ে ও কমে। তেমনি জুয়ায় এক পক্ষ হারে আর এক পক্ষ জিতে। যারা হারে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বর্তমানে এসব ব্যবসা হিসাবে গণ্য হচ্ছে।

تنيو অর্থ বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্তি। এক ধরনের মোনাফাখোরী ব্যবসা। এর মাধ্যমে বিনা পরিশ্রমে একদল লোক প্রচুর অর্থ কেড়ে নেয়। শাহ অলিউল্লাহ বলেন, জুয়া একটি হারাম ব্যবসা, এর দ্বারা একদল সামাজিক ও অর্থনৈতিক মোনাফাখুর ব্যক্তির জন্ম হয়।[৪৫] এভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত লটারী ঘাড়ার দৌড়, টাকা পয়সা বাজি ধরা এসবই প্রতারণা (ধোকাবাজী) ও মোনাফাখোরী। মোট কথা যে সব ব্যবসা বাণিজ্যে ও লেনদেনে জালিয়াতী, ফটকা বাজারী ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং অধিক মুনাফাখোরীর অবকাশ থাকে, ইসলামে এসব নিষিদ্ধ।

মদীনায় গাছের ফলফলাদি এবং ক্ষেতের শষ্য পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করে দেয়ার পদ্ধতি চালু ছিল। রসূলুল্লাহ স. সে পদ্ধতির বেচাকেনা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ফল-ফলাদিতে পরিপক্কতার চিহ্ন ফুটে না উঠা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। খেজুর লাল না হতে, শস্যদানা সাদা না হতে এবং সে গুলো নষ্ট না হওয়ার আংশংকা থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثِمَارِ حتى يبدوا صلاحها

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, ব্যবহার উপযোগী না হলে রসূলুল্লাহ স. ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[৪৬]

نهى ان تباع تمرة النخل حتى تزهو

রসূলুল্লাহ স. পাকার পূর্বেই খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, পাকার অর্থ কি? তিনি বললেন, লোহিত বর্ণ ধারণ করা। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা বলতো আল্লাহ যদি ফলের উৎপাদন প্রতিরোধ করেন তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন অধিকারে তার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে। ইবনে শিহাব বলেন, কোন ব্যক্তি যদি উপযোগিতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল ক্রয় করে এবং পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকে ঐ ক্ষতির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।[৪৭]
উল্লেখিত পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে ধোকা প্রতারণা ও মুনাফাখোরীর আশ্রয় নেয়া হয়, যে কারণে এটা হারাম। ইমাম বুখরী স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করছেন, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক দোযখী।[৪৮]
তিনি আরো বলেন, সওয়ারের ঘোড়া, উট, গাধা এমন কি বোঝা বহনরত মানুষ ইত্যাদির পিঠ থেকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় মরদুদ আল্লাহদ্রোহীতা যদি এটা জেনে করা হয়। বিক্রির ক্ষেত্রে এটা ধোকাবাজি ও প্রতারণা আর ব্যবসায় প্রতারণা জায়েজ নেই।[৪৯]
আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী বলেন, "শরীয়ত সামাজিক কল্যাণ ও জনকল্যাণকে ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর স্থান দেয়, সে জন্য ধোঁকা প্রতারণা ও মুনাফাখোরী হারাম এটা শুধু ক্রয় বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এটা এমন এক অনৈতিক কাজ যা একবার বিস্তার লাভ করলে দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দেয় এবং দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মুনাফাখোরের হাতে বন্দী হয়ে যায়। আর মানুষের সরলতার সুযোগে তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তাদের হাতের মুঠোতে নিয়ে নেয়।

৩. মাপে বা ওজনে কম দেয়া

পণ্য বিক্রয়ে মাপে বা ওজনে কম দেয়া এক প্রকার ধোকাবাজী। জাহেলী যুগে এক ধরনের মুনাফাখোর এ কাজ করত। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোর ভাবে একাজ নিষেধ করেছেন ঃ

واوفوا الكيل و الميزان بالقسط ولا نكلف نفسا الا وسعها

তোমরা মাপ ও ওজনের কাজ ন্যায্যভাবে সুসম্পন্ন করবে। সাধ্যের অতীত কাজ করতে আমরা কাউকে বাধ্য করি না।[৫১]

وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ مُسْتَقِيْمُ ذلك خير و احسن تاويلا

'তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণ করে মাপবে। আর সুদৃঢ় সঠিক দাঁড়িপাল্লার দ্বারা ওজন করবে। এ নীতি অতীব কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই ভাল ও উত্তম।'৫২

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ......

'মাপে ওজনে যারা কম দেয় তাদের জন্য বড়ই দুঃখ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয় তখন পুরাপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখেনা যে তারা সে কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে সেদিনসমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে।'৫৩

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কোন জিনিস বিক্রি করলে মেপে বিক্রি কর এবং কোন জিনিস ক্রয় করে মেপে নাও।৫৪

عن النبى ﷺ قال كيلوا اطعامكم يبارك لكم

নবী করিম স. বলেন, তোমরা তোমাদের খাদ্য দ্রব্য ওজন করবে তাহলে তোমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে।৫৫

জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাবা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে আমি তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য খেজুর নিয়ে আসলাম। তখন রাসূল স. সেখানে বসলেন, এবং আমাকে বললেন এবার মেপে মেপে মানুষকে দিতে থাক। আমি মেপে মেপে দিতে থাকলাম। সবার পাওনা পরিশোধ করার পরও আরো খেজুর থেকে গেলো, মনে হলো কিছুই কমেনি।

মুসলিম জাতির কর্তব্য হলো পূর্ণ সুবিচার নীতি অবলম্বন করা। যেসব জাতি তাদের পারস্পরিক কার্যাদি ও লেন-দেনে জুলুম করেছে বিশেষ করে পরিমাপে ও ওজনে সুনীতি লংঘন করেছে, পণ্য বিক্রয়ে লোকদের ঠকিয়েছে, তাদের করুন পরিণতির কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَوْفُوْا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ- وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ-

'তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে লোকদের জন্যে ক্ষতিকারক হয়ো না। আর সঠিক পাল্লায় ওজন কর। লোকদের দ্রব্যাদি কম দিও না। এবং পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।৫৬

কেনা ও বেচার জন্য দু-রকমের পরিমাণ ও দুধরনের পাল্লা ব্যবহার করা কোন ভাবেই বৈধ কাজ নয়। এটি একটি নিকৃষ্ট কাজ মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা এ ধরনের কাজ করে মানুষকে ধোকা দিয়ে থাকে।

৪. কিরা-কসম করে ব্যবসা করা

ধোঁকাবাজির সাথে মিথ্যা কিরা কসম করা হলে এ কাজ অধিক মাত্রায় হারাম হয়ে যায়। নবী করিম স. ব্যবসায়ীদের সাধারণভাবে মিথ্যা কিরা-কসম করেত নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, কিরা কসম দ্বারা পণ্য তো বিক্রি করা যায় কিন্তু বরকত পাওয়া যায় না।[৫৭]

রাসূল স. বলেন, তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পাক পবিত্রও করবেন না, তাদের মধ্যে একদল হলো মিথ্যা শপথ করে জিনিষপত্র বিক্রয়কারী। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধি করে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রেতার কাছে কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে বলার যে প্রবণতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ইসলামের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ অবৈধ।

৫. সুদী ব্যবসা

ব্যবসায়ের মাধ্যমে মূলধনের মুনাফা অর্জন করা ইসলামে সম্পূর্ণ জায়েয। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা। তবে তোমাদের সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতিতে ব্যবসায় হলে দোষ নেই।[৫৮]

ইসলাম চায় পৃথিবীতে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা হবে যাতে কেউ অতি বিত্তশালী থাকবে না এবং গরীব বিত্তহীনও থাকবেনা। সমাজের প্রতিটি লোকের জীবনধারা গড়ে উঠবে মধ্যবর্তী অবস্থায়।

অন্যদিকে একটি গোষ্ঠী অবৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ উপার্জন করবে, সমস্ত প্রাচুর্য শুধু নিজেদের ভোগ বিলাসে ব্যবহার করবে পক্ষান্তরে কোন কোন শ্রেণী গরীব অভাবী ভিখারী অসহায় থাকবে, এই ব্যবস্থা আল্লাহ চান না।

মূলত সুদখোর ও মুনাফাখোর অর্থ সম্পদের নেশায় মাতাল হয়ে পড়ে সে সুদী কারবার করতে গিয়ে মানবিক, নৈতিকতা বোধ, মনুষ্যত্ব সমবেদনা এমন কি মানবতাকে অর্থহীন মনে করতে থাকে। স্বার্থপরতা লোভ লালসা এবং অন্যদের ধ্বংস করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা তার জীবনের লক্ষ্য মনে করে। নিজ স্বার্থের ধাঁধায় সে হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। নির্যাতিত নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের কথা শুনেনা। সে অর্থের নেশায় অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদের অবস্থা কুরআনে বলেন ঃ

সুদখোররা পরকালে এমনভাবে দাঁড়াবে ভূত যেন তাদের জড়িয়ে ধরেছে এবং তারা মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে পড়েছে। এরূপ এ জন্য যে তারা বলছে বেচাকেনা সুদের মতই লেনদেনের ব্যাপার।[৬০]

বর্তমানে এ সুদকে বলা হয় বাণিজ্যিক সুদ যা পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থায় চালু রয়েছে। আমরা দেখি সুদী ব্যাংকগুলো সুদের মাধ্যমে বড় বড় পুঁজিপতির সীমাহীন সম্পদ জমা করা ও লাগামহীন মুনাফাখোরীর উৎকৃষ্ট

মাধ্যম। এর মাধ্যমে সম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। তাতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

৬. নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা

নেশা জাতীয় দ্রব্যাদিকে ইসলামী বিধানে পাপের জননী ام الخبائث বলা হয়েছে। কেননা মাদক দ্রব্যাদি সকল প্রকার অশ্লীলতা ও চরিত্র হননের মূল। সেজন্য ইসলাম নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি সেবনকারীর জন্য কঠিন শাস্তি আরোপ করেছে। এবং এ সবের ব্যবসা হারাম করেছে। রাসূল স. বলেন, সেই ব্যক্তির উপর লানত যে ব্যক্তি মদ জাতীয় বস্তুর নির্যাস বের করে, যে ব্যক্তি মদ প্রস্তুত করে, যে ব্যক্তি মদ পান করে, যে মদ পান করায় বা পরিবেশন করে, যে ব্যক্তি মদ আমদানী করে, যার জন্য মদ আমদানী করা হয়, মদ বিক্রেতা, মদ ক্রেতা, অন্যকে সরবরাহকারী, মদের লাভের অংশ ভোগকারী।৬১

সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতগুলো নাযিল হলে রাসূল সা. বের হয়ে ঘোষণা দিলেন,

حرمت التجارة فى الخمر 'আমি মদের ব্যবসা হারাম করলাম।'

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে;

ان الذى حرم شربها وحرم بيعها

'যিনি মদপান হারাম ঘোষনা করেছেন-তিনিই এর কেনা বেচাকেও হারাম করেছেন।'৬২

৭. চোরাচালান বা চোরাই কারবার

ইসলাম সবধরনের অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয় কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে শুনে ক্রয় করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। কেননা তা করা হলে চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করিম স. বলেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে চুরির মাল ক্রয় করল সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হল।৬৩

الاحتكار। **গুদামজাতকরণ ঃ** এর অর্থ বাজারে মূল্যবৃদ্ধির জন্য মাল গুদামজাত করে রাখা। তবে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য জমা রাখা ইহতেকারের মধ্যে পড়ে না। এটি ইমাম মালেকের মত।৬৪

আবু হানিফ রা. বলেন الاحتكار। -এর আভিধানিক অর্থ حكر আটক রাখা, মজুদ করা, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ধরে রাখা, একচেটিয়া করে নেয়া, কোন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় আটক রাখা।৬৫

পারিভাষিক অর্থে ঃ ইহতেকার বলা হয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য আটক রাখা। অথবা খাদ্যশস্য ক্রয় করে চল্লিশ দিন আটক রাখা। আবূ হানিফা র. রাসূল স. এর এই হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন,

من احتكر طعام اربعين ليلة فقد برى من الله و برى الله منه -

'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখে সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আল্লাহ্ ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।'৬৬

وايما بقعة فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله

যে এলাকার মানুষ ক্ষুধার্ত রাত্রি যাপন করে আল্লাহ্ সে এলাকার লোকদের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন না।৬৭
ইমাম শাফেয়ী বলেন, ইহতেকার অর্থ মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য আটকে রাখা, মূল্য বৃদ্ধি হলে তা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা। তবে বাজারে দাম কম থাকলে আটক করে রাখা সাধারণভাবে হারাম বলে গণ্য হবে না। তেমনি নিজের পরিবারের প্রয়োজনে আটক করে রাখলে সেটা ইহতেকারের মধ্যে পড়বে না। অথবা যে দামে ক্রয় করা হয় মূল্য বৃদ্ধি হলেও সে দামেই বিক্রি করলে তা ইহতেকার হবে না।৬৮
পরিবারের জন্য এক বছর খাদ্য গুদামজাত করে রাখা কেউ কেউ অপছন্দ করেন। তবে বিক্রি করে দেয়াই উত্তম।

পণ্য মজুদ ও মজুদদার

অস্বাভিকভাবে অধিক মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীগণ সুলভ পণ্য বিপুল পরিমাণে খরীদ করে মজুদ করে রাখে। ফলে বাজারে দুষ্প্রাপ্যতার দরুন এর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য তীব্র গতিতে উর্ধ্বগামী হতে থাকে। যার পরিণামে তা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এবং দেশে হাহাকার পড়ে যায়। হয়তবা অনাহারে কিংবা অর্ধাহারে মানুষের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রয় হয়। তখন মুনাফা শিকারীদল নিজেদের ইচ্ছে মত দর নির্ধারণ করে এবং পশ্চাতদ্বার হতে উক্ত মাল বিক্রয় করতে থাকে। কোন সময় প্রকাশ্যভাবে বিক্রি করে। ফলে জনগণের পক্ষে এরূপ পণ্য সংগ্রহ করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর সংগ্রহ করা গেলেও সেজন্য অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য দিয়ে জনগণকে সর্বশ্বান্ত হতে হয়। ইসলামের অর্থনীতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের Hoerding আদৌ সমর্থন করে না। ইসলামের পরিভাষায় এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে ইহতেকার ও ইফতেকাম।
ইহতেকার অর্থ হলো সম্পদ বিশেষ একটি শ্রেণীর হাতে পুঞ্জিভূত ও কুক্ষিগত হওয়া। আর ইফতেকাম বলতে বুঝায় বিপুল সম্পদ কোন ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হওয়া এবং তা ছড়িয়ে দেয়ার ও বন্টনের কোন ব্যবস্থা না থাকা। ইসলাম এ দুটির কোনটি অনুমোদন করে না। ইহতেকার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, যারা সোনা-রূপা (ধন সম্পদ) জমা করে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না তাদের আপনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দিন।৬৯
ইহতেকার সম্পর্কে রাসূল স. বলেন, من احتكر فهو خاطئ
পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অপরাধী।৭০

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يحتكر الطعام

অধিক মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্য খাদ্যদ্রব্য আটক করে রাখতে নবী করিম স. নিষেধ করেছেন।[৭১]

من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برى من الله و برى الله منه

'যে লোক চল্লিশ রাত্র খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে গেল এবং আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।'[৭২]

পণ্য মজুদকারীর মনস্তাত্ত্বিক বীভৎস মনোভাব ও লোভের ব্যাখ্যা দিয়ে রসূলুল্লাহ স. বলেন,

بئس العبد المحتكر ان ارخص الله الاسعار احزن وان اغلها فرحا.

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেলে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে আর বৃদ্ধি পেলে আনন্দে মেতে উঠে।[৭৩]
আবু আমামা রা. রাসূল স. থেকে বর্ণনা করেন,

من احتكر طعاما اربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة

যে লোক চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য আটক করে অতঃপর যদি তা সম্পূর্ণ দান করে দেয় তবুও তার আটক করে রাখার গুনাহের কাফফারা হবে না।[৭৪]

من احتكر حكرة يريد ان يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ

যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর মূল্যবৃদ্ধির আশায় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে সে অপরাধী ও গুনাহগার।[৭৫]

عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام و الافلاس

মুয়াম্মার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী খাদ্যশস্য জমা করে রাখে আল্লাহ তাকে অভাব অনটন ও কুষ্টরোগ দিয়ে শাস্তি দিবেন।[৭৬]
তিনি আরো বলেন,

الجالب مرزوق و المحتكر ملعون

বাজারে পণ্য সরবরাহকারী রিযিক প্রাপ্ত হয় আর পণ্য মজুদকারী হয় অভিশপ্ত।[৭৭]
এছাড়াও রাসূল স. যে ব্যক্তি জিনিসের দাম জানে না তাঁর নিকট উচ্চদামে মাল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এবং উচ্চমূল্যে বিক্রি করাকে সুদ হিসাবে গণ্য করেছেন।

কেননা ব্যবসায়ীগণ দুইটির কোন একটি পদ্ধতিতে মুনাফা করে। একটি হচ্ছে সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে বাজারে যখন এই পণ্যের অভাব তীব্র হয়ে উঠে তখন যে মূল্যই দাবি করা হবে তা দিয়েই লোকের ক্রয় করতে বাধ্য হবে।

আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ব্যবসায়ী সহনীয় মুনাফা নিয়ে তা বিক্রি করে দিবে। পরে এ মূলধন দিয়ে সে আরও পণ্য নিয়ে আসবে। তাতে সে পুনপুন মুনাফা পাবে। মুনাফা লাভের এ নীতি ও পদ্ধতিই সমাজের জন্য কল্যাণকর। এতে বরকত বাড়ে; তাই নবী করিম এ ব্যবসায়ীর পুঁজিতে বরকত বাড়ার কথা বলেছেন।

পণ্য মজুদকরণ ও পণদ্রব্য নিয়ে খেলা করা যে কত বড় অপরাধ তা রাসূল স.এর একটি বাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। মা'কাল ইবনে ইয়ামার রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন উমাইয়া প্রশাসক উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি তাঁকে বললেন, হে মা'কাল আপনি কি জানেন, আমি কোন হারাম রক্তপাত করেছি? বললেন, আমি জানিনা। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমি মুসলমানদের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ করেছি? বললেন তাও আমি জানিনা। পরে মা'কাল লোকদের বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসিয়ে দিল। তিনি তখন বললেন, হে উবায়দুল্লাহ! শোন! আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি, যা রাসূল স. এর নিকট থেকে আমি দুইবার শুনেছি। তিনি বলেছেন, মুসলিম জনগণের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি কেউ কোন হস্তক্ষেপ করে তবে আল্লাহর অধিকার রয়েছে তিনি কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের উপর বসাবেন। এ কথা শুনে উমাইয়া শাসক বললেন, আপকি কি নিজেই এ হাদীস রাসূলের স. মুখে শুনেছেন? তিনি বললেন এক দু'বার নয়।

মজুদদারী সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতি

হযরত উমর রা. খেলাফত কালে ব্যবসায়ীদেরকে মজুদ করনে বাধা দিতেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের বাজারে কেউ যেন পণ্য মুজদ করে না রাখে। যাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ আছে তারা যেন বহিরাগত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সমস্ত খাদ্যশস্য কিনে তা মজুদ করে না রাখে। যে ব্যক্তি শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য নিয়ে আসে সে উমরের মেহমান। অতএব সে তার আমদানির খাদ্যশস্য যে পরিমাণে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবে, আর যে পরিমানে ইচ্ছা রেখে দিতে পারবে।[৮৩]

উসমান রা.-ও তাঁর খেলাফতে মজুদ করে রাখাকে নিষিদ্ধ করেছেন। যেহেতু মজুদদারী জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থি তাই ইসলাম এর ঘোরবিরোধী। মজুদদারীর কুপ্রভাবে জনসাধারণের জীবন-যাত্রা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। কেননা মানুষের এমন অনেক প্রয়োজন আছে যেগুলোকে পরিহার করে চলা যায় না। সে জন্য পণ্য দ্রব্যাদি সহনীয় মূল্যে বিক্রি করা অত্যাবশ্যকীয়।

সাহাবীদের কর্ম পদ্ধতি

বনি আদী বিন কাব গোত্রের আবি মামার হতে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন, মজুদদার ভ্রান্ত পাপী, আমি সায়ীদ বিন মুসাইয়্যাকে বললাম, আরে তুমিও তো মাল মজুদ কর। তিনি বললেন, মামার মাল মজুদ করতেন। তিনি

খেজুরের আঁটি সূতা এবং বীজ মজুদ করে রাখতেন। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস আবু ঈসা বলেন ফকীহগণ খাদ্যশস্য মজুদ রাখা অপছন্দ করেছেন। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় নয় যেমন তুলা, চামড়া ইত্যাদি মজুদ রাখাতে দোষ নেই।[৮৩]

মজুদদারী সম্পর্কে ফকীহদের অভিমত

হাম্বলী ইমামগণের মতে তিনটি শর্তে ইহতেকার হারাম ঃ

১. ক্রয়কৃত মাল যদি আমদানীকৃত মাল না হয়। যদি আমাদানীকৃত মাল হয় গুদামজাত করার কারণে এর মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে তা ইহতেকারের মধ্যে পড়বে না। কেননা রাসূল স. বলেছেন, বাজারে পণ্য আমদানীকারক রিযিক প্রাপ্ত। আর পণ্য মজুদকারী অভিশপ্ত।[৮৪]

২. পণ্য খাদ্যদ্রব্য হতে হবে কারণ এটি জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। খাদ্যদ্রব্য নাহলে গুদামজাত করা হারাম হবে না।

৩. সে পণ্য যদি মানুষের ক্রয়সাধ্য বস্তু হয়, সেটা দু'ভাগে বিভক্ত

(ক) ছোট শহর বা গ্রাম হলে গুদামজাত করলে মানুষের কষ্ট দেখা দিতে পারে এবং দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে যেতে পারে, যদি বড় শহর হয় যেখানে অধিক দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করা হয় সেখানে ইহতেকার করা হারাম হবে না। যদি গুদামজাত করলে মানুষের দুর্ভোগ না হয় তবে-

খ) অভাবের সময় যদি কোন বাণিজ্যিকদল তাদের দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করে আর ধনী লোকেরা খাদ্যদ্রব্য সঙ্কট সৃষ্টির জন্য তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে ও গুদামজাত করে তাহলে উহা হারাম হবে। যদি বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য কমমূল্যে পাওয়া যায় এবং কারো কষ্ট না হয় তাহলে গুদামজাত করে রাখা হারাম হবে না।[৮৫]

কোন ধরনের মাল গুদামজাত করা বৈধ হবে?

ফকীহগণ ঐক্যমত্য পোষন করেছেন যে অভাব ও প্রয়োজনের সময় গুদামজাত বৈধ নয়। যদি দেশে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি থাকে আর বিদেশ থেকে মাল আমদানী করার প্রয়োজন দেখা দেয় সে সময়ে গুদামজাত করা বৈধ নয়। এর বিপরীত হলে গুদামজাত করা হারাম হবে না। ফকীহগণ বলেন, যে মাল গুদামজাত করা হারাম তাহলো খাদ্যদ্রব্য, অথবা মানুষের খাদ্য যেমন, গম, যব, ডাল, চাউল, তৈল, খেজুর, কিশমিশ, আঙ্গুর, অর্থাৎ যে সব মাল বা খাদ্যদ্রব্য শারীরিক গঠন বৃদ্ধি করে এবং পুষ্টি যোগায়। তেমনিভাবে পশুর খাদ্যও গুদামজাত করা হারাম। আবু হানিফা, শাফেয়ী ও হাম্বেলীও এ মত পোষণ করেন। তারা পশুর খাদ্য, শুষ্ক ঘাস, কাঁচা ঘাস মজুদ করে রাখা অবৈধ মনে করেন।

ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফ প্রাচুর্যের সময় ছাড়া প্রয়োজনী খাদ্যদ্রব্য ও মানুষের জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিষ গুদামজাত করা বৈধ মনে করেন না। অথবা যে সব মাল গুদামজাত করলে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে সেটা খাদ্য, কাপড় অথবা দিরহাম হোক তা গুদামজাত করা বৈধ হবে না।

সরকী (ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী) বলেন, অভাবের সময় মধু, ঘি, তিলের তৈল এ ধরনের জিনিস গুদামজাত করলে যদি মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে গুদামজাত করা হারামের মধ্যেই পড়বে। যদি ক্ষতির কারণ না হয় তাহলে গুদামজাত করতে কোন অপরাধ নেই। তবে কাজটি অপছন্দনীয়।

সারকথা ঃ ফকীহগণ মানুষ ও পশুর খাদ্য গুদামজাত হারাম হওয়ার কথা বলেছেন। অবশ্য ইমাম মালেক সব ধরনের হালাল খাদ্য গুদামজাত করতে নিষেধ করেছেন।

গুদামজাত করার সময় কত দিন ?

যদি অল্প কয়েকদিনের জন্য গুদামজাত করা হয় তাহলে কোন ক্ষতির ভয় থাকে না। আর যদি দীর্ঘ সময় ধরে করা হয় তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কেউ বলেন, সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন। তারা আলোচ্য হাদীস দিয়ে দলিল দেন। কেউ বলেছেন, এক মাস। চল্লিশ দিনের অধিক রাখলে দুনিয়াতে তাকে শাস্তি দিতে হবে। এর চেয়ে কম আটক রাখলে সে গুনাহের কাজ করবে।

গুদামজাত করার হুকম কি?

গুদামজাত নিষেধ ঃ অধিকাংশ হানাফী ফকীহ্ গুদামজাত করা হারাম মনে করেন। তারা বলেন, কোন শহরে গুদামজাত করলে সেখানকার অধিবাসীদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বিশেষ করে মানুষ ও পশুর খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা নিষেধ। যেমন কাফেলার কাছ থেকে আগেভাগে সস্তায় কেনার উদ্দেশ্য সাক্ষাত নিষেধ। অথবা আমদানী নিষেধ। তবে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন না হলে কোন দোষ নেই।[৮৭]

কাসানী বলেন, গুদামজাত হারাম নয় তিনি এ ব্যাপারে অন্যান্য ইমামদের সাথে একমত পোষণ করেন।

গুদামজাত হারাম ঃ গুদামজাত করা হারাম ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে অনেক গুলো হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি। যে ব্যক্তি মুসলমানদের খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করবে আল্লাহ্ তাকে অভাব কুষ্ট রোগ দিয়ে শাস্তি দিবেন।[৮৮]

গুদামজাত মাল বিক্রি সম্পর্কে হানাফী ইমামগণের মতে কাযীর পক্ষ থেকে তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় মাল রেখে গুদাসজাত অবশিষ্ট মাল বিক্রি করে দিতে হবে। যদি ব্যবসায়ী এ আদেশ অমান্য করে গুদামজাত করার উপর জিদ ধরে তাহলে দ্বিতীয়বার কাযীর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। তখন কাযী তাকে নসিহত করে সাবধান করে দিবেন যদি তাতেও সে রাযী না হয় তাহলে তৃতীয়বার কাযির নির্দেশে তার মাল আটক করে তাকে ভৎসর্না করা হবে এবং বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে। হানাফীদের মতে যদি খাদ্যদ্রব্য হয় তাহলে ব্যবসায়ী তার মাল যে দামে ক্রয় করেছে সে দামেই বিক্রি করে দিবে।

ইমাম মালেক বলেন, জনসাধারণ যে মালের মুখাপেক্ষী হলে যে দামে ক্রয় করেছে সে দামে বিক্রি করে দিবে আর যদি মূল্য অজানা থাকে তাহলে গুদামজাত করার দিন যে দামে ক্রয় করেছে সে দামে বিক্রি করে দিবে।[৮৯]

ইমাম আবু হানিফা আরো বলেন ঃ কাযি যদি মনে করে শহরের অধিবাসীগণ না খেয়ে মারা যাবে তাহলে গুদামজাতকারীর কাছ থেকে সমস্ত মাল নিয়ে জনগণের মাঝে বন্টন করে দিবে। সংকট কেটে গেলে তাকে

সে পরিমাণ মাল ফেরত দিবে। এটা প্রয়োজনের সময় যে ব্যক্তি অন্যের মাল গ্রহণ করতে একান্ত বাধ্য হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর ভয় থাকে সে অনুমতি ছাড়াই তার মাল গ্রহণ করবে। পরে সে তার মূল্য পরিশোধ করবে। কারণ বাধ্য হয়ে খাওয়ার দরুণ অন্যের অধিকার বাতিল হয় না।[৯০]

বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

ফকীহদের অভিমত, স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সরকারের নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেন, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হারাম। হালেম্বলীগণ বলেন, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করার অধিকার সরকারের নেই বরং মানুষ তাদের সুবিধামতো লেনদেন করবে। এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো-

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল স.-এর যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল স. আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন আল্লাহ্‌ মূল্য নির্ধারণকারী তিনিই নিয়ন্ত্রণকারী, প্রশস্তকারী ও রিযিক দানকারী। আমি এমন অবস্থায় আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখি যে তোমাদের কেউ যেন তার জান-মালের উপর আমি হস্তক্ষেপ করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ না করতে পারে।[৯১]

তাদের দ্বিতীয় দলীল ক্রেতা বিক্রেতা হচ্ছে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের অধিকারী। অতএব তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা শাসকের জন্য সমীচীন নয়। তবে জনসাধারণ যখন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য রাষ্ট্র এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

কারণ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ মূলত ক্রেতা বিক্রেতার ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সমঝোতার ব্যাপার। মূল্য নির্ধারণে তাদের স্বাধীনতা থাকা দরকার। অন্যথায় তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে। তবে এ ব্যাপারে কারো উপর কোন জুলুম হলে কিংবা প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে জনগণের বিশেষ অসুবিধা হলে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে হাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কেননা তখন ব্যাপারটি ব্যক্তিগত না থেকে সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়।[৯২]

বাজারে পণ্যমূল্যের সামঞ্জস্য বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। এখানে ইচ্ছামত অধিক মূল্য গ্রহণের অধিকার কাউকে দেয়া হয় না। অনুরূপভাবে ন্যায্য মূল্যের অনেক কমে বিক্রয় করে ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) সৃষ্টি করার সুযোগও কাউক দেয়া যায় না। হযরত উমর রা. এক লোককে বাজারদর থেকে কমমূল্যে মোনাক্কা বিক্রি করতে দেখে বললেন, হয় প্রচলিত মূল্যে বিক্রি করে অন্যথায় আমাদের বাজার থেকে চলে যাও।[৯৩]

কারণ এককভাবে কোন একজন ব্যবসায়ী পণ্য মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে হ্রাস করে দিয়ে সকল খরিদ্দার নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইলে গোটা বাজার ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে যাবে। তাতে অন্য ব্যবসায়ীরা

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেজন্য সাঈদ ইবনে মুসায়্যাযীয়া, ইয়াহইয়া ইবনে সায়দ প্রমুখ ফকীহগণ মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া বৈধ মনে করেন। মোট কথা, খাদ্য শস্য মজুদ রাখা, গুদামজাত করা, মুনাফাখোরী দালালি, মাপ ও ওজনে কম দেয়া, সুদ, চুরি, প্রতারণার ডাকাতি মদ বিক্রি এসব দ্বারা কিছু লোকের বৈষয়িক স্বার্থ হলেও গোটা সমাজের ক্ষতি হয়। তাই ইসলাম এ ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য অবৈধ ঘোষণা করেছে।

ভেজাল ঃ আবরীতে বলা হয় غش -এর আভিধানিক অর্থ نقيض النصح মূল্যের বিপরীত। যেমন বলা হয় মিশ্রিত দুধ। অথবা মূল জিনিষ নষ্ট করা যেমন ভেজাল স্বর্ণকে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা। বাংলাতে এর অর্থ ঃ ঠকবাজী, চুরি, নকল, জাল, ভেজাল।

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ মূল জিনিসের পরিবর্তে বিক্রেতা ক্রেতাকে কোন জিনিস হস্তান্তর করা।

ভেজাল শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণ মানুষ ভেজাল বা নকল বলতে শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে ও লেনদেনে ভেজাল করাকেই বুঝিয়ে থাকে।

ভেজালের প্রতিশব্দ ঃ যেমন ঃ تدلس অর্থ ধোকা التدليس فى البيع। লেনদেনে ধোকা দেয়া, অর্থাৎ বিক্রেতা তার মালের দোষ গোপন রেখে বিক্রি করা। এ ধরনের বিক্রি এক প্রকার ভেজাল।

تغرير প্রতারণা ও ধোকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। মালের গুণাগুণ বর্ণনা না করে মাল বিক্রি করা অথবা মূল জিনিস গোপন রেখে মালের অতিরিক্ত প্রশংসা করা। এটা এক প্রকার ভেজাল।

الخلاجة। ধোকা দেয়া। মুখের কথা দিয়ে ধোকা দেয়া। এক ব্যক্তি নবী স. এর নিকট বলল, ক্রয় বিক্রয়ে সে প্রতারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি কোন কিছু খরিদ করবে তখন বলবে যেন ধোকা না দেয়া হয়।[১৪]

ভেজাল ব্যবসা ঃ

ইসলাম ধোকা, প্রতারণা, ঠকবাজি, ভেজাল, নকল ব্যবসার সকল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছে। তা ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কেই হোক কিংবা অন্যান্য যে বিষয়েই হোক, কোনক্রমেই তা জায়েয নয়। ইসলামের দাবী হচ্ছে সব ব্যাপারেই মুসলমান সততা অবলম্বন করবে, ইসলামের দৃষ্টিতে বৈষয়িক স্বার্থের চেয়ে নৈতিক তা অত্যধিক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

নবী করিম স. বলেন,

البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما و ان كذبا و كتما محقت بركة بيعهما

ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয় বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা বেচাকেনায় সত্য কথা বলে এবং জিনিসের দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে

তাহলে বেচাকেনায় বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে ও জিনিসের দোষ গোপন করে তাহলে বেচাকেনায় বরকত বা কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যায়।[৯৫]

তিনি আরো বলেছেন, কোন পণ্যের দোষত্রুটি না বলে বিক্রি করা হালাল নয়। আর জানা সত্ত্বেও না বলা হারাম।[৯৬]

লেনদেনে ভেজাল করার ঘটনায় রসূলুল্লাহ স. এর একটি প্রসিদ্ধ নির্দেশনা

عن ابو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بلالا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال اصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال افلاجعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غشنا فليس منى- و فى حديث اخر من غشنا فليس منا

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হল। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল স. বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ স. বললেন, তাহলে এগুলো উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখেশুনে ক্রয় করত। যে ব্যক্তি আমার সাথে প্রতারণা করে (ভেজাল দেয়) সে আমার দলভুক্ত নয়। অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৯৭]

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করিম স. অপর এক খাদ্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। সে খুব ভাল পণ্য নিয়ে বসেছিল। তিনি তার খাদ্যের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন খুব নিকৃষ্ট মানের খাদ্য নিচে রয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন, এ খাবার আলাদা বিক্রয় করবে এবং এ খাবার স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় করবে। জেনে রাখ, যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজী (ভেজাল দেয়) করবে সে আমাদের কেউ নয়।[৯৮]

[অসমাপ্ত]

[প্রবন্ধের বাকী অংশ আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে, ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক]

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ২৮২, সূরা নেসা ২৯, সূরা তাওবা : ২৪, সূরা নূর ৩৭ সূরা ফাতির : ২৯, সূরা সাফ : ১০, সূরা জুমআ : ১১, সূরা বাকারা : ১৬ যেমন

الاان تكون تجارة عن تراض من كم

'তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।' সূরা নেসা : ২৯

২. রাগিব ইস্পাহানি, আল-মুফরাদাত : পৃষ্ঠা : ৭২
৩. কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামুল কুরআন, বৈরুত, দারুল মালাইন, খন্ড : ১৮ পৃষ্ঠা-৮৮
৪. সূরা বাকারা : আয়াত : ১৬; উক্ত আয়াতে দালালাত ও হেদায়াত দুটিকে বিনিময়যোগ্য ও বিকল্পযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে. ব্যবসায়ে ঠিক তাই করা হয়। পণ্য দিয়ে মূল্য নেয়া হয় এবং মূল্য দিয়ে পণ্য গ্রহণ করা হয়. কুরআনে একাজটিকে তেজারত বলা হয়েছে।. তা হলে তেজারত হচ্ছে এমন কার্যক্রম যেখানে দুটি জিনিসের পরস্পর বিনিময় সংঘটিত হয় এবং তাতে মুনাফা ও ক্ষতি হতে পারে। তেজারত শব্দটি এখানে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত ও আযাব থেকে নাজাত পাওয়া এবং জান্নাত লাভের উপায় হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলে দেব না যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? সূরা আসসাফ : ১১ এখানে তেজারতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঈমান ও জিহাদ দ্বারা। সানাউল্লাহ পানিপতি বলেন, এখানে তেজারত মানুষকে নিঃপীড়ণকারী আযাব থেকে নিস্কৃতি দেয়া কে বুঝানো হয়েছে; যেমন দুনিয়ার ব্যবসা মানুষকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জ্বালা থেকে নিস্কৃতি দেয়। তাফসীর আল-আযহারী, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭
৫. মুসনাদ আহমদ, বৈরুত, ১৯৮৮ইং খন্ড : ১৬ পৃঃ ১৮০
৬. ইবনে কাছির, আসসীরা আন-নবুবীয়া, বৈরুত, দারুল মালাইন ১৯৮০ পৃষ্ঠা ৪২৯
৭. আহমদ, তাবারী।
৮. ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুলবারী, খন্ড, ৪, পৃষ্ঠা : ৩০৫
৯. মোকদ্দমা ইবনে খালদুন, অনুচ্ছেদ ১৫, অধ্যায় ৪, পৃষ্ঠা ৩৬৭, ও যাকী মাহমুদ নুজুমুল ইকতেসাদীয়া, কায়রো, ১৯২৩. পৃষ্ঠা : ১৬
১০. আয়াতে فانتشروا। অর্থ তোমাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য ব্যবসায় বের হও. ابتغوا من فضل الله। অর্থ আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন তা অর্জন করার চেষ্টা কর. শওকানী, ফতহুল কাদীর, খন্ড ৫. পৃষ্ঠা: ২২৭।
১১. তাবরানী, সূয়ুতী দুররুল মনসুর, খন্ড, ২ পৃষ্ঠা ২২০
১২. পূর্বোক্ত
১৩. পূর্বোক্ত
১৪. সূরা নাহল ঃ ১৪
১৫. তিরমিযি, আবওয়াবুল বুয়ূ, খন্ড ২ পৃ: ৩৬৩, হাদীস নং ১১৪৭, ই.ফা., ঢাকা
১৬. দুররুল মনসুর, খন্ড ২, পৃ: ১৪৪

১৭. তিরমিযি খন্ড ২. পৃষ্ঠা : ৩৬৪. হাদীস নং ১১৪৮, ই.ফা. ঢাকা।
১৮. কানযুল উম্মাল, খন্ড ৩য়, পৃষ্ঠা : ১৯৪
১৯. সূরা ঃ মায়েদা : ২
২০. বুখারী ও মুসলিম
২১. সূরা নিসা : ২৯
২২. সূয়ুতী, দুররুল মনসুর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৭
২৩. বায়হাকী
২৪. মুয়াত্তা, ইমাম মালেক, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ১১৬
২৫. মুসলিম
২৬. তাফসীরে মারাগী খন্ড ৩, পৃষ্ঠা : ৬৪
২৭. বাংলাদেশে ইসলাম, আব্দুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮০ পৃষ্ঠা ২০
২৮. তিরমিযি, বায়হাকী, হাকিম, দারেমী
২৯. ইবনে মুনযির
৩০. তাফসীরে আল-মাযহারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭, সূরা নিসা
৩১. ড. গরীব জামাল, মাসারেফ অ-আযামাল আল-মাসরাফিয়া, দারুশ শরুক, কায়রো, ১৯৭২, পৃষ্ঠা : ২৭৯
৩২. পূর্বোক্ত
৩৩. আব্দুর রহমান উমাইরী, বেয়ালুনল হাওলে মা আন-যালাহু আল-কুরআন, দারুল আল-লাওয়া, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮৪, খন্ড ১, পৃষ্ঠা : ২৯
৩৪. বুখারী, কৃষিকার্য অধ্যায়, হাদীস নং ১, ই.ফা. ঢাকা
৩৫. মুসনাদ আহমদ, খন্ড ১৯, পৃষ্ঠা : ১৯৫
৩৬. বাহী খাওলী, ইকতেসাদুল ইসলামী, বৈরুত, ১ম সংস্কারণ, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ১১৩
৩৭. বুখারী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৯, ই.ফা. ঢাকা।
৩৮. ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল কাদির, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৫
৩৯. বুখারী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ৩৪১ ই.ফা. ঢাকা
৪০. ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ উদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ৮৯ ই: কা: ঢাকা।
৪১. সহীহ বুখারী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা-৩৪১, ই.ফা. ঢাকা।
৪২. জামে তিরমিযি (ই.ফা. ঢাকা) খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ৩৭৪
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৭৫
৪৪. সূরা মায়েদা : ৯০
৪৫. শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৮৯

৪৬. বুখারী, খন্ড ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৬
৪৭. পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা : ৩৫৯
৪৮. তালীকাত ইমাম বুখারী
৪৯. পূর্বোক্ত
৫০. আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নি, শরহে বুখারী, খন্ড ৫. পৃষ্ঠা : ৫০৩, ৫০৪
৫১. সূরা আল আনআম : ১৫২
৫২. সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৫
৫৩. সূরা আল মুতাফফিফিন : ১-৬
৫৪. বুখারী, খন্ড, ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৩
৫৪. পূর্বোক্ত ৩৩৪
৫৫. পূর্বোক্ত
৫৬. সূরা, আশ-শু'আরা : ১৮৩
৫৭. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল বুয়ু খন্ড : ২, হান্ত ১৯৪৫
৫৮. মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা: ৮৩
৫৯. সূরা আন-নেসা ঃ ২৯
৬০. সূরা বাকারা : ২৭৫
৬১. ইবনে মাজা
৬২. মুসলিম
৬৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী কর্তৃক উদৃত 'ইসলামে হালাল-হারামের বিধান' অনুবাদ মাওলানা আব্দুর রহীম, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৫ইং
৬৪. মুনতাকী আলাল মুয়াত্তা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা : ১৫, কাওয়ানীন ফকীহা, পৃষ্ঠা : ২৫৫
৬৫. আল ইনায়া, সরহে হিদায়া, রদ্দুল মুখতার, খন্ড, ৫, পৃষ্ঠা : ২৮২, আল বিদায়ে আস সানায়ে, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা : ১২৯
৬৬. আহমদ হাকিম, তাবরানী, নাইলুল আওতার, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-২২১
৬৭. পূর্বোক্ত
৬৮. আল-মুগনী আল-মুখতার, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ৩৮. সুবুলুস সালাম, খন্ড, ৩. পৃষ্ঠা : ২৫
৬৯. সূরা তাওবা : ৩৪, ৩৫
৭০. মুসলিম
৭১. বায়হাকী
৭২. মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৪৬৪৮
৭৩. মুসলিম
৭৪. মুসনাদ আহমদ, খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা : ১১২
৭৫. হাকিম, ফতহুলবারী, খন্ড ৪ পৃষ্ঠা : ৩৪৮

৭৬. ইবনে মাজা, কিতাবুত তেজারত, হাদীস নং ২১৪৪
৭৭. জামে সগীর, হাদীসের সনদ উত্তম।
৭৮. মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা ১২৩
৭৯. মুসনাদে আহমদ
৮০. মুয়াত্তা মালেক
৮১. উসূলে মা'আশিরাত, খন্ড ১, অধ্যায় পৃষ্ঠা : ২১২
৮২. তিরমিযি
৮৩. প্রফেসর টাসিগ, উসূলে মা-আশিরাত, খন্ড ১ পৃষ্ঠা ২১৩
৮৪. ইবনে মাজা, কিতাবুত তেজারাত, হাদীস নং ২১৪৪ ই.ফা., ঢাকা।
৮৫. এনায়া ফি সরহে হেদায়া, খন্ড, ১ পৃষ্ঠা ; ১৩৬, রদ্দুল মুখতার, খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা : ২৮২ আল-লুবাব, খন্ড ৪ পৃষ্ঠা : ১৬২
৮৬. বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল বুয়ু
৮৭. দুররুল মুখতার, পূর্বোক্ত
৮৮. ইবনে মাজা, নাইলুল আওতার, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা : ২২০
৮৯. মুনতাকী, মুয়াত্তা খন্ড ৫, পৃষ্ঠা: ১৭
৯০. দুররুল মুখতার, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৮২, আল বিদায়া, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা : ১২৯
৯১. তিরমিযি, আবওয়াবুল বুয়ু, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৩, ই.ফা.; ঢাকা
৯২. ইমাম শাফেয়ী বলেন, দুর্ভিক্ষ বা স্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি দেখা দিলে তখন দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া বৈধ. রাসূলের হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় স্বাভাবিক অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ জুলুম. আর যদি জনসাধারনের উপর জুলুম হয় তখন নির্ধারণ না করাই বড় জুলুম।
৯৩. ইমাম মালেক, মুয়াত্তা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ১১৬
৯৪. বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, খন্ড ২, পৃষ্ঠা : ৩২৯, ই. ফা. ঢাকা।
৯৫. পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা ৩২৬
৯৬. ড. ইউসুফ আন-কারযাবী আল-হারাম ওয়ান-হালাল, পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা : ৩৩৯
৯৭. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৪৭
৯৮. মুসনাদ আহমদ হাদীস নং ৪৮৬৭

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-১০০

ইসলামী প্রেক্ষিতে ব্যাংক কার্ড ঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ রুহুল আমিন

আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। মানুষ তাই জীবনযাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর ও সহজসাধ্য করার প্রয়াসে নিত্য নতুন পথ-পদ্ধতি আবিস্কারে রত। ফাইন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির সাথে সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিনের (Automated Teller Machine-ATM) মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের পদ্ধতি চালু করেছে বিশেষ ব্যাংক কার্ড সরবরাহের মাধ্যমে। এই ব্যাংক কার্ড বর্তমানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবখানে জনপ্রিয় লেনদেন হিসেবে স্বীকৃত, যা প্লাস্টিক মানি নামে সমধিক পরিচিত। কেননা এই কার্ডের মাধ্যমে মানুষ চুরি বা হারানোর আশংকাকে ঝেড়ে ফেলে নিরাপদে অনায়াসে তার ব্যাংকিং স্থিতি (Balance) বহন করতে পারে। পণ্য ক্রয়, নগদ অর্থ উত্তোলন, বিভিন্ন ফি পরিশোধ, বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তর, ঋণ পরিশোধের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এটি নগদ অর্থের স্থান দখল করে নেবে। জনগণের নগদ অর্থ গ্রহণ ও বিনিয়োগের পর এটি ব্যাংকসমূহের তৃতীয় প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য হতে শুরু হয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ঘনিষ্ঠ এই পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনাই হবে এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

আলোচনার সুবিধার্থে **'আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড'** ও **'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী'** কাল্পনিক নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংক কার্ড ঃ এটি একটি প্লাস্টিক কার্ড। এর গায়ে পৃষ্ঠপোষক সংস্থা, তার স্থানীয় প্রতিনিধি ও গ্রাহকের নাম, তার হিসাব নম্বর, ইস্যুর ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ খোদাই করা থাকে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের সাথে একটি চুক্তির আলোকে এটি ইস্যু করে থাকে যে, তিনি এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয় ও নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন, অতঃপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ

লেখক : প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা।

ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার মূল্য অথবা নগদ উত্তোলিত অর্থ গ্রাহকের স্থিতি থেকে উভয়ের মধ্যকার চুক্তির ভিত্তিতে সংগ্রহ করবে।

ব্যাংক কার্ড যেভাবে কাজ করে ঃ ব্যাংক কার্ড সাধারণত ঃ দু'টি কাজ করেঃ (১) নগদ অর্থ উত্তোলন ও (২) পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ।

নগদ অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি

১। নির্ধারিত মেশিনের নির্ধারিত স্থানে কার্ড ঢুকানোর পর মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্ডটিকে নিজের ভেতরে টেনে নেয়। যদি মেশিনটি একাধিক ভাষায় নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতাম্পন্ন হয় তবে বাহক কোন ভাষার নির্দেশনা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রথমে তা নির্ধারন করতে হয়।

২। নির্দেশনার ভাষা বাছাই করার পর মেশিনটি কার্ডের সাথে দেয়া একটি গোপন নম্বর (Password) তলব করে। নম্বরটি সঠিক না হলে কার্ড কোন কার্যক্রম করে না।

৩। গোপন নম্বরটি সঠিক হলে বাহক কোন জাতীয় লেনদেন (Transaction) করতে চান তা মেনু থেকে নির্ধারণ করতে হয়।

৪। বাহক যদি নগদ অর্থ উত্তোলন করতে চান সেহেতু তাকে নগদ উত্তোলন (Withdraw) অপশন বাছাই করতে হয়।

৫। মেশিন তখন বাহক কত অর্থ উত্তোলন করতে চান তা জানতে চায় এবং উক্ত পরিমাণ অংক টাইপ করার পর যদি সেই পরিমাণ অর্থ উত্তোলন তার জন্য অনুমোদিত হয় তবে সাথে সাথে মেশিনের অভ্যন্তরে রক্ষিত অর্থ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার মুদ্রা বেরিয়ে আসে।

৬. অতঃপর বাহক যদি অন্য কোন লেনদেন না করেন তবে তার কার্ড মেশিন থেকে বেরিয়ে আসে এবং কিছুক্ষণ পর একটি রিপোর্টও বেরিয়ে আসে যাতে তার কৃত লেনদেন ও হিসাবের স্থিতি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন থাকে।

পণ্য সেবার মূল্য পরিশোধ করার পদ্ধতি

১. ক্রেতা তার কার্ডটি বিক্রেতার হাতে দেন, বিক্রেতা কার্ডটি মেশিনে নির্ধারিত নিয়মে প্রবেশ করিয়ে বের করে আনেন।

২. বিক্রেতা পণ্য বা সেবার মূল্যের অংক মেশিনে টাইপ করেন।

৩. ক্রেতা নিজ হাতে তার কার্ডের গোপন নম্বর টাইপ করেন।

৪. স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিনের সাথে কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংকের যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়।

৫. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একমত হওয়া পরিমাণ অর্থ যদি অনুমোদিত হয় তবে মেশিন থেকে অনুমোদনের দু'টি কাগজ আসে যাতে কর্তিত অর্থের পরিমাণ, কার্ড নম্বর লেনদেন নম্বর ও প্রাথমিক তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে।

৬. বিক্রেতা উক্ত কাগজের একটিতে গ্রাহকের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন এবং অন্য এক কপি কাস্টমারকে প্রদান করেন। আর এভাবে ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ব্যাংক কার্ডের গুরুত্ব ঃ ঝুঁকি বা ব্যাংক কার্ড ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই যুগান্ত কারী প্রভাব ফেলেছে। এ কার্ড তার বাহককে অর্থ হারানো, নষ্ট বা চুরি হওয়া থেকে নিরাপত্তা দান করে। একইভাবে এটি নগদ অর্থ বহন করা থেকেও অনেক ঝুঁকি বা ঝামেলামুক্ত। কেননা এ কার্ড ৯/৫ বর্গ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় হয় না; তাছাড়া কার্ড নম্বর খোদাই করা থাকে বিধায় মুছে যায় না। এ কার্ড বর্তমান সময়ে ব্যবসা, হোটেল, রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের জন্য প্রাধান্য দেয়া হয়। এটি বাণিজ্য বিপণীগুলোতে পণ্যের সমারোহ বৃদ্ধি ও অধিক হারে মুনাফা অর্জনের অন্যতম কারণ।

কার্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল কম্পিউটারে লেনদেনের নির্দেশনা দৃশ্যমান হওয়ার পর থেকে অর্থের প্রাপক ব্যবসায়ী যে কোন সময়ে তার অর্থ ফেরত গ্রহণ করতে পারেন বিধায় তার প্রাপ্যের বিষয়ে তিনি নিশ্চিত থাকেন।

আর এসব কিছু সম্ভব হয় দ্রুতগতি সম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় মেশিনের কারণে, কেননা তাতে গ্রাহকের প্রাথমিক তথ্য, তার স্থিতি এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ লেখা থাকে, অতঃপর কাষ্টমারের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করলে কর্তৃপক্ষ পাওয়া অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করেন, গ্রাহকের নিজের হিসাব থেকে হোক বা তার প্রদত্ত গ্যারান্টির অর্থ থেকে হোক।

ব্যাংক কার্ডের উপকারিতা ঃ বিশ্বব্যাপী ব্যাংক কার্ডের জনপ্রিয়তার পিছনে এর চতুর্মুখী উপকারিতা জড়িত। কেননা এ কার্ড একাধারে তার ধারক, ইস্যুকারী ব্যাংক ও পণ্য বা সেবা বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সকল পক্ষের জন্য বহুবিধ উপকার বয়ে আনে।

(ক) গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধাসমূহ

১. অর্থ বহনের ক্ষেত্রে এ কার্ড নিরাপত্তাস্বরূপ। কেননা নগদ অর্থ বহনের ক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই হারানো ইত্যাদির ঝুঁকি থেকে যায়।

২. যে কোন সময় কোন পণ্য কেনার ইচ্ছা হলে কার্ড থাকলেই সম্ভব হয় যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার উদ্দীষ্ট ব্যাংকের শাখা থাকে।

৩. বাহক এর মাধ্যমে যে কোন ধরনের মুদ্রায় লেনদেন করতে পারেন। যেসব দেশে বিদেশী মুদ্রা প্রবেশ ও প্রস্থান করানো নিষেধ সেসব দেশে এ কার্ড থাকলে বাহক সহসা যে কোন ধরনের আর্থিক লেনদেন করতে পারেন।

৪. এ কার্ড হিসাব রক্ষণ, খরচের সীমানির্ধারণ ও পাওনা পরিশোধের এক অনন্য মাধ্যম।

৫. যে কোন রাষ্ট্রে নগদ অর্থের সুবিধা (Cash Facilities) প্রদান করে।

৬. কোন কোন কার্ড তার ধারককে ইস্যুকারী ব্যাংকের যে কোন শাখা বা এর সাথে লেনদেন করে এমন ব্যাংক থেকে অথবা উক্ত ব্যাংকের এ.টি.এম থেকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করার সুবিধা প্রদান করে। এই সেবাটির মাধ্যমে গ্রাহকের সময় বাঁচে, কেননা সরাসরি (চেক বা অন্য কোন মাধ্যমে) টাকা উত্তোলন করতে অনেক সময় ও ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়।

৭. অনেক সময় কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাণিজ্যিক কোম্পানীর সাথে কৃত চুক্তির আলোকে কার্ড ধারকের জন্য পণ্যের দাম বাজার দরের চেয়ে কম গ্রহণ করে।

৮. কোন কোন কার্ড বাহকের জীবন বীমার সুবিধা প্রদান করে, যেমন গোল্ডেন কার্ড এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান করে, যেমন টিকিট ক্রয়, হোটেল-রেস্তোরাঁ বুকিং, স্বাস্থ্যবীমা, আইনী সেবা গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান।

৯. এ জাতীয় কার্ড হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে সামান্য কিছু প্রতিস্থাপন ফি প্রদান করে পুনরায় এটি গ্রহণ করা যায় এবং গোপন নম্বর জানা না থাকলে অন্য কেউ এ কার্ড ব্যবহার করতে পারে না।

খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীর সুবিধাসমূহ ঃ এই কার্ড ব্যবহারের ফলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী বিভিন্ন ধরনের সুবিধা লাভ করে থাকে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(১) উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক সংস্কৃতি, উত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ী নতুন নতুন গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে পারেন।

(২) ব্যবসায়ী নগদ অর্থ চুরি বা ছিনতাই হওয়ার ঝুঁকি থেকে বাঁচেন।

(৩) কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনকৃত অর্থ ব্যবসায়ীকে প্রদান করতে বাধ্য থাকেন যখন ব্যবসায়ী শুদ্ধভাবে তার প্রমাণাদি উপস্থান করেন। এ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবসায়ীকে আগাম ঋণও প্রদান করে যা পরবর্তীতে উক্ত লেনদেনের অর্থ থেকে সমতা বিধান (Adjust) করা হয়।

(খ) ব্যাংকের সুবিধাসমূহ ঃ ব্যাংক এ জাতীয় কার্ডের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ফায়দা অর্জন করে থাকে; যেমন-

১। কার্ড ইস্যু বা সদস্য ফি অর্জন।

২। কার্ড নবায়ন ফি অর্জন, কেননা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ কার্ডের মেয়াদ হয় এক বছর।

৩। কার্ড হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে নতুন কার্ড প্রদানের সময় গৃহীত প্রতি-স্থাপন ফি।

৪। কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি কেউ তা নবায়ন করতে চায় সে ক্ষেত্রে আগাম ফি গ্রহণ।

৫। ব্যবসায়ীর সাথে কৃত চুক্তি অনুযায়ী কার্ডের মাধ্যমে বিক্রিত পণ্যের মূল্যের উপর শতকরা হারে কমিশন গ্রহন করে একইভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময় গ্রাহক থেকেও একটি শতকরা হারে কমিশন গ্রহন করে।

৬। বিদেশী মুদ্রায় লেনদেন সম্পাদিত হলে সে ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ রেট গ্রহণ করে।

৭। দেশের বাইরে কাষ্টমারের কোন বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সময় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে ফিস গ্রহণ।

৮। কাষ্টমার নির্ধারিত সময়ে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ।

৯। কোন কোন সময় ব্যাংক কার্ড দিয়ে এ.টি.এম. বা ইলেক্ট্রিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করলে ব্যাংক একটি নির্ধারিত হারে কমিশন পেয়ে থাকে।

১০। ভিসা সংস্থার অনুগামী বিদেশী কোন ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করলে স্থানীয় ব্যাংক নির্ধারিত হারে কমিশন পেয়ে থাকে।

ব্যাংক কার্ডের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের নিজস্ব পলিসি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাংক কার্ড ইস্যু হয়ে থাকে। তবে ব্যাংক কার্ডকে নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়[১]

১। ডেবিট কার্ড (Debit Card)

২। চার্জ কার্ড (Charge Card)

৩। ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)

১- ডেবিট কার্ড (Debit Card) t

এ কার্ডকে এ.টি.এম কার্ড, ভিসা ইলেক্ট্রোন কার্ড, মানি ড্র কার্ড, সিটি কার্ড ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। এই কার্ডটি শুধুমাত্র গ্রাহকের একাউন্টের স্থিতি থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন ও ক্রয়কৃত পণ্য দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ডেবিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য[২]

ক) এই কার্ড ব্যাংকের সেই সব গ্রাহকদের জন্য ইস্যু করা হয় যাদের উক্ত ব্যাংকে একাউন্ট আছে।

খ) এই কার্ড নগদ অর্থ বহন করার সুবিধা সম্মলিত যা অর্থ হারানো বা চুরি হওয়ার মত ঝুঁকি কমায়।

গ) এই কার্ড ব্যবহার করার সাথে সাথে গ্রাহকের হিসাব থেকে ব্যবহৃত অর্থ কর্তন করা হয়, যদি তার স্থিতি না থাকে তবে এ কার্ড অতিরিক্ত কোন অর্থের আঞ্জাম দিতে পারে না।

ঘ) সাধারণত এই কার্ড ব্যবহারের জন্য গ্রাহক থেকে কোন অতিরিক্ত চার্জ কাটা হয় না। তবে ভিন্ন দেশী মুদ্রা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মেশিনে ব্যবহার করে কোন কার্য সম্পাদন করলে সে ক্ষেত্রে চার্জ প্রদেয় হয়।

ঙ) গ্রাহকের ব্যক্তিগত হিসাব সম্পর্কিত তথ্য অবগত হওয়ার জন্যও এই কার্ড ব্যবহৃত হয় যেমন- গ্রাহকের হিসাবের স্থিতি, সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত হিসাব বিবরণী, হিসাব থেকে কর্তন বা সংযোজন ইত্যাদি।

চ) এই কার্ড সৎসামান্য ফি দিয়ে বা বিনা মূল্যে ইস্যু করা হয়।

ছ) কোন কোন ব্যাংক এই কার্ডের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্যের একটি শতকরা হার গ্রহন করে।

এই কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে পার্থক্য

এই কার্ডে গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের কোন ঋণ প্রদানের সম্পর্ক থাকে না বরং তার হিসাব থেকে সরাসরি অর্থ ব্যবসায়ীর হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। পক্ষান্তরে ক্রেডিট কার্ডের চুক্তির আলোকে ব্যাংক চুক্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে।

২- চার্জ কার্ড (Charge Card)

যে কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে স্বল্প পরিসরে ঋণ প্রদান করে, যা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তিকৃত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কার্ড ধারকের হিসেবে স্থিতি থাকার প্রয়োজন পড়ে না। তবে পরিশোধে বিলম্ব করলে নির্ধারিত হারে বাড়তি সুদ প্রদান করতে হয়।

চার্জ কার্ডের বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) এই কার্ড নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যম। একইভাবে এটি অর্থ পরিশোধেরও মাধ্যম।

খ) এইকার্ড পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ ও নগদ অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

গ) এই কার্ড তার বাহককে নতুন কোন ঋণ সুবিধা প্রদান করে না, কেননা এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘ) যদি কার্ডের ধারক তার উপর অর্পিত অর্থ অনুমোদিত সময়ের মধ্যে দিতে বিলম্ব করে তবে তার উপর জরিমানা দিতে হয়।

ঙ) ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে কার্ডের ধারক থেকে কোন কমিশন গ্রহণ করে না, কিন্তু কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট কমিশন গ্রহণ করে।

চ) এই কার্ডের কারণে ব্যাংক বিক্রেতাকে পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। আর এই বাধ্যবাধকতা কার্ড ধারক কর্তৃক কার্ড ব্যবহারের কারণে নয় বরং পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধের বিষয়ে একান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা।

ছ) কার্ড ধারকের জন্য প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার একান্ত ও প্রত্যক্ষ অধিকার কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে। এ অধিকার কার্ডের ধারক ও ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষ্যের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

চার্জ কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে পার্থক্য

এই দুই ধরনের কার্ডের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান ঃ

১। এই কার্ড ইস্যু বা নবায়ন করতে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে চার্জ গ্রহণ করে। কিন্তু সাধারণত ক্রেডিট কার্ডের উপর বাৎসরিক বা নবায়নের সময় কোন চার্জ নেয়া হয় না।

২। এই কার্ডের ধারকরা তাদের উপর আগত অর্থ প্রতি মাসের শেষে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকেন পক্ষান্তরে ক্রেডিট কার্ডের ধারকদের জন্য ব্যাংক থেকে সরাসরি ঋণ প্রদান করা হয় যা পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে, গ্রাহক যে কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

৩। এই কার্ডের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের একটি সর্বোচ্চ সীমা রয়েছে এবং বাহক মাসের শেষে বা স্বল্প সময়ের মধ্যে তা পরিশোধে বাধ্য থাকেন, অন্যদিকে ক্রেডিট কার্ডের ধারককে ঋণের সীমাবদ্ধতায় আটকাতে হয় না এবং জরিমানা দিয়ে পরিশোধের সময় বিলম্বিত করা যায়।

৩- ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)

যে কার্ড ব্যাংক তার গ্রাহককে এই শর্তে ইস্যু করে যে, এর মাধ্যমে তিনি একটি গন্ডির মধ্যে নগদ অর্থ উত্তোলন ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারবেন। ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ কিস্তি সুবিধার মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন এবং বাড়তি লাভ বা জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন। বর্তমান বিশ্বে এ কার্ডের প্রচলন বেশী। এই কার্ড আবার তিন ধরনের হয়ে থাকেঃ-

১. সিলভার কার্ড বা সাধারণ কার্ড ঃ যে কার্ডে ঋণ গ্রহণের একটি সর্বোচ্চ সীমা থাকে।

২. গোল্ডেন কার্ড বা এক্সিলেন্ট কার্ড ঃ এই কার্ডে ঋণ প্রদানের কোন সীমা থাকে না, যেমন-আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড যা একটি নির্দিষ্ট ফিস প্রদানের ভিত্তিতে ধনীদের জন্য ইস্যু করা হয়।

৩. প্লাটিনিন কার্ড ঃ এটি গ্রাহকের অর্থনেতিক অবস্থানের আলোকে বিভিন্ন ধরনের ও বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এই কার্ড স্বল্প ঋণ, বৃহৎ ঋণ, দুর্ঘটনা, বীমা, হারানোর ক্ষতিপূরণ, বিভিন্ন হোটেলে ডিসকাউন্ট, গাড়ী ভাড়া করা, কোনো কমিশন ছাড়া টুরিস্ট চেক ইত্যাদি প্রদানের মত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা প্রদান করে।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরনের ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো ঃ ভিসা কার্ড (Visa Card), মাস্টার কার্ড (Master Card), আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড (American Express), ডাইনারস ক্লাব কার্ড (Diners Club) ইত্যাদি।

ক্রেডিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য

ক) এই কার্ড নির্ধারিত সময়ের জন্য নতুন নতুন পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যম। একইভাবে এটি পরিশোধেরও মাধ্যম।

খ) এই কার্ড পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ ও অনুমোদিত ক্ষেত্রে নগদ অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ) পণ্য ক্রয় বা কোন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই কার্ডের বাহক নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কোন প্রকার বাড়তি ছাড়া তার ঋণ পরিশাধ করতে পারবে। বাড়তি সহকারে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করাও অনুমতি রয়েছে। আর নগদ অর্থ গ্রহণের কোন মেয়াদ নেই।

ঘ) ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে কার্ডের ধারক থেকে কোন কমিশন গ্রহণ করে না, কিন্তু কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন গ্রহণ করে।

ঙ) এই কার্ডের কারণে ব্যাংক বিক্রেতাকে পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। আর এই বাধ্যবাধকতা কার্ড ধারক কর্তৃক কার্ড ব্যবহারের কারণে নয় বরং পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধের বিষয়ে একান্ত তথা প্রত্যক্ষ বাধ্যবাধকতা।

চ) কার্ড ধারকের জন্য প্রদত্ব অর্থ ফেরত নেয়ার একান্ত ও প্রত্যক্ষ অধিকার কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে। এ অধিকার কার্ডের ধারক ও ব্যবহারকারী

কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্যাংকিং কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ

ব্যাংকি কার্ডের ব্যবহার ও এ সংশ্লিষ্ট সেবা থেকে উপকৃত হওয়ার অন্তরালে কয়েকটি পক্ষ ও তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

পক্ষ-১ ব্যাংক কার্ডের পৃষ্ঠপোষক কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, সাধারণত আন্তর্জাতিক কোম্পানী হয়ে থাকে; যেমন-(ভিসা), (মাস্টার কার্ড) ইত্যাদি কোম্পানী।

পক্ষ-২ স্থানীয় প্রতিনিধি অর্থাৎ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান যা তার গ্রাহকদের জন্য এ জাতীয় ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকে। আমাদের এ গবেষণায় যা 'আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড' নামে পরিচিত।

পক্ষ-৩ ব্যবসায়িক বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ এ প্রবন্ধে 'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী' যা পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানান্তে এ.টি.এম. এর মাধ্যমে অর্থ গ্রহন করে থাকে। এটি মূলত ব্যবসায়ী এবং একে (কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয় প্রতিনিধি) বলে আখ্যায়িত করা হয়, যা স্থানীয় ব্যাংক বা কোম্পানীর সাথে এই কার্ডের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে।

পক্ষ-৪ কার্ডের ধারক মূলতঃ ব্যাংক বা কোম্পানীর একজন গ্রাহক, যার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুবিধা সংযুক্ত ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকে।[৫]

পক্ষ-৫ কেউ কেউ এই চার পক্ষের পরে আরও এক পক্ষ বৃদ্ধি করেছেন; আর তা হলো- ঐ ব্যবসায়ী ব্যাংক যে বিক্রয় বিল পরিশোধের বিষয়ে ব্যবসায়ী ও ব্যাংক কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করে।[৬]

পক্ষসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক

উক্ত পাঁচ পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের চুক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হয়, যেমন-

সম্পর্ক-১ ব্যাংক কার্ডের পৃষ্ঠপোষক সংস্থা ও মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ চলমান প্রবন্ধে 'আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড'-এর মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-২ মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ চলমান প্রবন্ধে 'আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড' ও পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানী বা 'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী'-এর মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৩ মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ চলমান প্রবন্ধে 'আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড' ও কার্ডের ধারক যিনি ব্যাংকের একজন গ্রাহক, তার মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৪ পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানী অর্থাৎ 'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী' ও কার্ড ধারকের মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৫ ব্যবসায়ী ব্যাংক ও কার্ড ইস্যুকারী মধ্যস্থতকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ চলমান প্রবন্ধে 'আল-আমীন ব্যাংক লিমিডেট' এর মধ্যকার সম্পর্ক।

ব্যাংক কার্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

প্রথমতঃ ব্যাংক কার্ডের পৃষ্ঠপোষক সংস্থা ও মধ্যস্থতাকারী ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ ঃ কার্ডের পৃষ্ঠপোষক ও মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা 'আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড'-এর মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক 'প্রতিনিধিত্বের চুক্তি' হতে পারে। কেননা কার্ডের পৃষ্ঠপোষক আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেডকে নিজ নামে তার প্রতিনিধি বানিয়েছে। আর এই প্রতিনিধিত্ব করার কারণে ব্যাংক নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক ও পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী কোম্পানীর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ ঃ

এ জাতীয় সম্পর্কের মধ্যে ওয়াকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) ও কাফালাহ (জামিন) দু'টি ফিকহী পরিভাষা বর্তমান রয়েছে। একদিক থেকে দেখা যায় কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বা 'আল-আমীন ব্যাংক লিমিটেড' এজেন্ট ও বাণিজ্যিক কোম্পানী বা 'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী' গ্রাহক থেকে অর্থ গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে 'আল-আমীন ব্যাংক লিমিটেড' গ্রাহকের ঋণের বিষয়ে কাফীল (জামিনদার) আর 'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী' মাক্ফুল (যার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে)।

তৃতীয়তঃ মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক ও কার্ড ধারকের মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ ঃ মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ চলমান প্রবন্ধে "আল-আমীন ব্যাংক লিমিটেড" ও কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তির সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান সময়ের ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতামতকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ

প্রথমত ঃ মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা 'আল-আমীন ব্যাংক লিমিটেড' ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার সম্পর্ক হলো কর্জ ও গ্যারান্টির সম্পর্ক। কেননা কার্ডের ধারক কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে ব্যাংক থেকে কর্জ গ্রহণ করে, তখন পণ্য বা সেবার মূল্য তার ঋণ হিসেবে পরিগণিত হয়; যা সে পরবর্তীতে পরিশোধ করে। একইভাবে ব্যাংক কার্ড সংক্রান্ত নীতিমালার অধিকাংশ শর্ত-শরায়েত ইসলামী শরীয়তের গ্যারান্টি ও চুক্তি তার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং ব্যাংক কার্ড ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তিত চার্জ গ্যারান্টির বিনিময় হিসেবে বিবেচ্য।[৭] আর ব্যবহারের পূর্বে অর্থাৎ যদি কার্ড বাহকের উপর কোন ঋণ সাব্যস্ত না হয় তাকে ফকিহগণের পরিভাষায় বলা হয় 'গ্যারান্টি যা এখনও সাব্যস্ত হয়নি'

জমহুর আলিমগণ এটাকে বৈধ বলেছেন।[৮]

দ্বিতীয় মত ঃ মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা 'আল-আমীন ব্যাংক লিমিটেড' ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো ওয়াকালা (প্রতিনিধিত্ব)। কেননা ব্যাংক এই কার্ডের চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে গ্রাহকের হিসাব থেকে পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ। অথবা ব্যাংকের নিজস্ব ফান্ড থেকে ক্রয় করে কাষ্টমারকে প্রদান করে এবং পরবর্তীতে কাষ্টমারের ব্যাংক কার্ড থেকে কর্তন করে। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্যাংক ওয়াকীল বা প্রতিনিধি এবং কাষ্টমার প্রতিনিধি নিয়োগকারী। ব্যাংক এই প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে ক্রয়কৃত মালের মূল্যে শতকরা হিসেবে অথবা যৎসামান্য একটি পারিশ্রমিক গ্রহণ করে আর ওয়াকালা বা প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ কোন প্রকার মতপার্থক্য ছাড়াই বৈধ।[৯]

তৃতীয় মত ঃ মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা 'আল-আমীন ব্যাংক লিমিটেড' ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো ওয়াকালা (প্রতিনিধিত্ব), কর্জ, কাফালা, (জামিন হওয়া) ও গ্যারান্টির সম্পর্ক। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কাষ্টমারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীক ঋণের অর্থ পরিশোধের প্রতিনিধি। অন্যদিকে যখন ব্যবসায়ী কাষ্টমার থেকে অনাদায়ী অর্থ সংগ্রহের জন্য কাষ্টমারের স্বাক্ষর সম্বলিত এ.টি.এম. মেশিনের রিসিভ কপি নিয়ে ব্যাংকে যায় তখন ব্যাংক সাথে সাথে তার প্রাপ্য পরিশোধ করে। আর এ প্রেক্ষিতে এর মধ্যে কর্জে হাসানার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থেকে যায়। একইভাবে এর অভ্যন্তরে কাফালা ও গ্যারান্টির বিষয়ও নিহিত। কেননা ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে পণ্য বা সেবা খরিদ করার বিনিময়ে গ্রাহকের কাছে প্রাপ্য অর্থের ব্যাপারে জামানত ও গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে।[১০]

আধুনিক সময়ের উলামায়ে কেরামের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক ও কার্ডের বাহকের মধ্যে এক চুক্তিতে বিভিন্ন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে ওয়াকালা, কর্জে হাসানা, কাফালাহ ও গ্যারান্টির সম্পর্ক বিদ্যমান।

চতুর্থত ঃ বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী কোম্পানী ও কার্ড ধারকের মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ ঃ

পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানী অর্থাৎ 'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী' ও কার্ড ধারকের মধ্যে দুটি সম্পর্কের যে কোন একটি থেকে মুক্ত নয়। তাদের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক হতে পারে এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কোম্পানী হবে বিক্রেতা ও কার্ডধারী হবেন ক্রেতা। আর তাদের মধ্যকার বেচাকেনা সম্পাদিত হবে ব্যাংক কার্ডের মাধ্যেম। অথবা তাদের মধ্যে ভাড়া ও উপকার হাসিলের সম্পর্কও হতে পারে যেমন- গাড়ী ও হোটেল ভাড়া করা ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হবেন সেবার মালিক আর কার্ডধারী হবেন উপকার গ্রহীতা এবং তাদের মধ্যকার লেনদেন ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।[১১]

ডেবিট কার্ডের বিধান

গ্রাহকের স্থিতি থেকে অর্থ উত্তোলন করার জন্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ জাতীয় কার্ড ইস্যু করা বৈধ, তবে এ লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুদী কারবার জড়িত থাকতে পারবে না।

বিধানের শরয়ী দলীল ঃ উপরোক্ত শর্তের আলোকে এ কার্ড ইস্যু করা বৈধ, কারণ এ ক্ষেত্রে কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই। আর যে কোন লেনদেনের মৌলিকত্ব হচ্ছে বৈধতা।[১২]

চার্জ কার্ডের বিধান ঃ নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান চার্জ কার্ড ইস্যু করতে পারে।[১৩]

ক) কার্ড ধারকের কাছে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করতে বিলম্ব হলে তার উপর কোন সুদ নির্ধারণ করা যাবে না।

খ) যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই কার্ডের বিপরীতে গ্যারান্টি স্বরূপ বাহককে অনুত্তোলনযোগ্য কোন স্থিতি জমা রাখতে বাধ্য করে তবে এ অর্থ মোদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং মুনাফা নির্ধারিত হারে তার ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্ড ধারককে এ মর্মে শর্ত প্রদান করবে যে, সে ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন কোন কাজে এই কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না, করলে প্রতিষ্ঠান এ কার্ড অকার্যকর করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিধানের শরয়ী দলীল

উপরোক্ত শর্তের আলোকে এ কার্ড ইস্যু করা বৈধ। কেননা এমন পরিসরে এর মধ্যে কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা থাকে না। সুদী লেনদেনের শর্ত সাপেক্ষে ঋণ সুবিধা প্রদান করার কোন চুক্তি করতে পারবে না। এ জাতীয় চুক্তি সংযুক্ত করলে বা ইসলামী শরীয়তের স্বীকৃতি নেই এমন কাজে ব্যবহার করলে হারামের পর্যায়ে চলে যাবে।[১৪]

ক্রেডিট কার্ডের বিধান

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদী কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের শর্তযুক্ত ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা বৈধ নয়।[১৫]

বিধানের শরয়ী দলীল

এ কার্ড ইস্যু করা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য হারাম হওয়ার কারণ, এর মাধ্যমে কার্ডের বাহক সুদযুক্ত কর্জ গ্রহণ করতে থাকে। আর সুদ দেয়া ও নেয়া উভয়ই হারাম। সুদের এ নিষেধাজ্ঞা কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল ও মুসলমানদের ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্থ

হয়েছে। প্রয়োজনের খাতিরে গৃহীত ঋণের উপর বাড়তি গ্রহণই সুদ। যদি সুদ ও অন্যান্য শরয়ী নিষেধাজ্ঞামুক্ত ব্যাংক কার্ড ইস্যু করা হয় তবে তা বৈধ।[১৬]

ক্রেডিট কার্ডের শরয়ী বিকল্প

সনাতন ব্যাংকগুলো যে ব্যাংক কার্ড ইস্যুর করে থাকে তার শরয়ী বিকল্প এই শর্তে হতে পারে না, এই কার্ড সংশ্লিষ্ট যে সব শরীয়াহ বিরোধী বিষয় জড়িত তা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষত: সুদ প্রদানের বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ডের দুটি শরীয়াহ বিকল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৭]

১-চার্জ কার্ড ঃ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান একটি শর্তে এটি ইস্যু করতে পারে যে, কার্ড বাহক তার মাসিক বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন যদি তার বেতনের হিসাব এই ব্যাংকে হয় আর অন্য ব্যাংকে হলে শতকরা ৮০% উত্তোলন করতে পারবেন। এবং এ ক্ষেত্রে বেতন বা অন্য কোন জামানত ব্যাংকে গ্যারান্টি হিসেবে রাখবেন। আর ব্যাংক এর জন্য কোন বাড়তি অর্থ নিতে পারবে না।

এ ব্যবস্থা ওয়াকালত বা প্রতিনিধিত্ব নীতিমালার ভিত্তিতে শরীয়ত সম্মত হবে যদি কি না গ্রাহকের উত্তোলিত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাংকে জমা থেকে থাকে। আর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রতিনিধিত্ব বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলিমগণের ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি গ্রাহকের উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ অর্থ তার একাউন্টে না থাকে তবে তার স্থিতির চেয়ে বেশী যে অর্থ তিনি গ্রহণ করেছেন তা ব্যাংক তাকে বেতন বা অন্য কোন জামানতের ভিত্তিতে কর্জে হাসানা স্বরূপ প্রদান করবে। এটি শরীয়ত সম্মত ও বৈধ।

২-মুরাবাহা কার্ড ঃ এটি ব্যবসার ভিত্তিতে প্রদেয়। এ কার্ডের ধরণ এমন যে, ধারক ব্যাংকের পক্ষ হয়ে তার ইচ্ছা মোতাবেক পণ্য ক্রয় করবে এবং পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে। ব্যাংক পণ্যের মালিকানা লাভ করবে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড হোল্ডাররা উক্ত পণ্য হস্তগত করবেন এরপর ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে বাইয়ে মুরাবাহার ভিত্তিতে তার প্রতিনিধির কাছে বিক্রয় করবে এবং প্রতিনিধি সাথে সাথে এর মালিকানা গ্রহণ করবেন। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় একে 'মুরাবাহা লি আমের বিশ শারা' নামে অভিহিত করা হয়। তবে বাস্তবতার নিরিখে এই কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। কেননা কার্ড বাহক এই কার্ড নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন এবং এমন অনেক দেশ রয়েছে যে দেশে এ কার্ডের ভিত্তিতে ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য ক্রয় সম্ভব নয়। একইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, কারণ কার্ড বাহক অনেক

সময় বিভিন্ন সেবা গ্রহণ যেমন-হোটেল বা রেস্টরেন্ট ভাড়া প্রদান ইত্যাদির মুখাপেক্ষী হয়, আর এ সব ক্ষেত্রে বাই মুরাবাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং এ কার্ড এ জাতীয় সেবার আঞ্জাম দিতে পারে না। আর এ কারণে এ কার্ডকে ক্রেডিট কার্ডের ইসলামী বিকল্প বলা খুবই কষ্টসাধ্য। স্বভাবতই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরীয়াহ কাউন্সিল মুরাবাহা কার্ডের প্রচলনের অনুমতি প্রদান করেননি। এ বিষয়টি আরো গবেষণা ও অনুসন্ধানের দাবী রাখে।

ব্যাংক কার্ডের ফিসের ফিকহী বিশ্লেষণ

কার্ড ইস্যুকারী মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় কার্ড ইস্যু, নবায়ন, পুনঃইস্যু বা এই কার্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত কোন কোন লেনদেনের উপর কোন শতকরা নির্ধারিত হারে চার্জ গ্রহণ করতে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কার্ড থেকে উপকার হাসিলকারী কর্তৃপক্ষ (এই প্রবন্ধে 'আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী') থেকেও নির্ধারিত হারে কমিশন গ্রহন করে। কার্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পাদনের বিপরীতে গৃহীত এ সব চার্জের ফিকহী বিশ্লেষণ আবশ্যক।

ব্যাংক কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ফিস

১. **কার্ড ইস্যুর ফিস ঃ** কার্ড ইস্যুর সময় একবারের জন্য এ ফিস প্রদান করতে হয়। এ ফিসকে গ্রাহক ফি (Subscription Fees) বা সদস্য ফি (Membership Fees) ও বলা হয়।

২. **কার্ড নবায়নের ফিস ঃ** সাধারণতঃ প্রতি বছর এই কার্ড নবায়ন করতে হয়, কেননা এ কার্ডের বৈধতার মেয়াদ শেষ হয় এক বছর। অতএব প্রতি একবছর মেয়াদ শেষে এই ফিস প্রদান করে কার্ডের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়।

৩. **মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে নবায়ন ফিস ঃ** যদি গ্রাহক কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নবায়ন করতে চায় তবে সে ক্ষেত্রে এ ফিস প্রদেয়। উদাহরণস্বরূপ 'ক' এর কার্ডের মেয়াদ শেষ হবে ৩১শে অক্টোবর, ২০০৮; কিন্তু তিনি সেপ্টেম্বরের শুরুতে বিশেষ কারনে আমেরিকায় যাচ্ছেন এবং সেখানে তিনি ৪ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত অবস্থান করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সেপ্টেম্বরে ভ্রমণে যাওয়ার আগেই কার্ডটি নবায়ন করে যাবেন।

৪. **কার্ড প্রতিস্থাপন ফিস ঃ** কার্ড হারানো গেলে বা নষ্ট হলে বা চুরি হলে অথবা তার গোপন নম্বর কেউ জেনে ফেললে কার্ড বা গোপন নম্বর বদলের জন্য কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক এ জাতীয় প্রতিস্থাপন ফিস গ্রহণ করে।

উপরোক্ত চার প্রকার ফিসের ফিকহী বিশ্লেষণ

উপরোক্ত চার প্রকার ফিস সেবা বা উপকার গ্রহণের বিপরীতে প্রদান করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধার জন্য গৃহীত চার্জ স্বরূপ। আর কার্ড ইস্যুকারী ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ জাতীয় ফিস গ্রহণ বৈধ।[১৮] যেহেতু এ কার্ড ব্যাংকের নিজস্ব সম্পত্তি এবং এই মালিকানা অন্য কারো কাছে স্থানান্তরিত হয় না; যা কার্ডের উল্টো পিঠে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ *থাকে। আর কাষ্টমার শুধুমাত্র এ থেকে* সেবা গ্রহণ করার অধিকার রাখেন। সেহেতু কার্ড থেকে সেবা বা উপকার গ্রহণের বিনিময়ে এ ফিস প্রদান করা হয়।

৫. **পণ্য বা সেবার মূল্যের উপর কমিশন ঃ** ব্যাংক কোন কোন সময় ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে কার্ড থেকে উপকার গ্রহণকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন গ্রহণ করে থাকে। আর এ কমিশন ব্যাংক গ্রহণ করে থাকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধের সময়। কার্ড ইস্যুকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ জাতীয় কমিশনের বৈধতা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে এটি ঋণ পরিশোধের ওকালাহ বা প্রতিনিধিত্বের বিনিময় স্বরূপ গৃহীত হয়।[১৯] কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের শরীয়াহ বোর্ডের দৃষ্টিতে এটি কার্ডধারক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতার ফিস।[২০]

আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাংক কার্ডের ব্যবহার (ই-ব্যাংকিং)

উদাহরণ ঃ জনাব "ক" আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যাংক কার্ডের ধারক। উক্ত ব্যাংকের কোন এক শাখায় তার দেশীয় মুদ্রায় একাউন্ট রয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি আমেরিকা সফর করলেন এবং তার একাউন্ট থেকে আমেরিকার স্থানীয় মুদ্রা (ডলার) উত্তোলন করার জন্য স্থানীয় যে ব্যাংকের সাথে আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানীর লেনদেন রয়েছেন এমন ব্যাংকের (ধরা যাক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) ATM বুথে গেলেন। জনাব "ক" তার একাউন্ট থেকে ১০০ ডলার উত্তোলন করার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার আল-আমিন ব্যাংকের হিসাব থেকে ৭০০০ টাকা (আনুমানিক) কর্তন হয়ে গেল। উত্তোলিত এই ১০০ ডলার আল-আমিন ব্যাংক আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানীকে (ভিসা, মাষ্টার, আমেরিকান এক্সপ্রেস) প্রদান করে। কেননা এই কোম্পানীই উভয় ব্যাংকের মধ্যস্থতাকারী। অতঃপর মধ্যস্থতাকারী কোম্পানী এই অর্থ আমেরিকার স্থানীয় ব্যাংকে (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) পরিশোধ করে। এ ক্ষেত্রে আল-আমিন ব্যাংক তার কার্ডধারক জনাব "ক" থেকে উত্তোলিত অর্থ ছাড়াও একটি নির্ধারিত অংক কমিশন হিসেবে গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে সেবা গ্রহণের কারণে আন্ত র্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানীকে দিতে হয়। আবার গ্রাহক যদি ডলার ছাড়া

অন্য কোন মুদ্রা যেমন ইউরো, দিনার, দিরহাম গ্রহণ করে তবে তার জন্য বাড়তি ১.৫% হারে 'এক্সচেঞ্জ ফি' প্রদান করতে হয়।[২১]

উল্লেখিত ট্রানজেকশনের ফিকহী বিশ্লেষণ

এ জাতীয় লেনদেনের দু'টি ফিকহী বিশ্লেষণ হতে পারে।

প্রথমত ঃ কার্ড ধারক আমেরিকান ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে যে অর্থ উত্তোলন করলেন তা তার ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড) এর পক্ষে নেয়া ঋণ স্বরূপ। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রান্ত হয়েছেঃ

ক) যেহেতু কার্ডধারী তার ব্যাংকের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক ই-ব্যাংকিং সার্ভিসের অধিভুক্ত যে কোন ব্যাংক থেকে নগদ/কর্জ গ্রহনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেহেতু তিনি সেই ক্ষমতা বলে উক্ত ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে উক্ত অর্থ কর্জ হিসেবে তলব করেছেন এবং ব্যাংক তার আবেদন মঞ্জুর করেছে।

খ) এই ঋণের দায় কার্ড ইস্যুকারী তথা-আল-আমিন ব্যাংকের উপর অতঃপর কার্ডধারীর উপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে কার্ডধারক ব্যাংককে তার হিসাব থেকে উক্ত কর্জ পরিশোধের অনুমতি প্রদান করে।

গ) যেহেতু কর্জ নেয়া হয়েছে স্থানীয় মুদ্রা তথা ডলার সেহেতু কর্জ পরিশোধ ও ডলারের মাধ্যমে করা বাঞ্চনীয়। আর এই অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের (আল-আমিন ব্যাংকের) কিন্তু যদি কার্ডধারীর হিসাবটি বৈদেশিক মুদ্রায় (Foreign Currency Account) না হয়ে স্থানীয় মুদ্রা হিসেবে (Local Currency Account) হয় এবং ব্যাংক উক্ত ঋণ ডলারে পরিশোধ করতে সম্মত হয় তবে সে ক্ষেত্রে মানি এক্সচেঞ্জের প্রশ্ন দেখা দেয়। তখন ব্যাংক জনাব "ক" এর একাউন্ট থেকে ডলারের সমপরিমাণ টাকা ও তার সাথে মানি এক্সচেঞ্জের কারণে অতিরিক্ত বিনিময় ফি গ্রহণ করে।

ঘ) আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানীর নেটওয়ার্ক এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে মাত্র্ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক থেকে ঋণের অর্থ ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) বরাবর পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

উক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ট্রানজেকশনের বিধান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, এ ক্ষেত্রে আল-আমিন ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যকার লেনদেনের সম্পর্ক ঋণ থেকে পরিবর্তিত হয়ে মুদ্রা বিনিময়ের পর্যায়ে

চলে যায় আর ঋণ ভিন্ন গোত্রীয় পণ্যে (মুদ্রায়) পরিশোধ বৈধ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়তে দুটি শর্ত রয়েছে।[২২]

১. বিকল্প মুদ্রায় ঋণ পরিশোধের চুক্তির মজলিসেই উভয় পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই তা হস্তগত হয়।

২. বিকল্প মুদ্রার হিসাব আজকের মূল্যে হতে হবে।

উপরোক্ত শর্ত দু'টির দলীল

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাকী উপত্যকায় উট বিক্রয় করতাম। কোন কোন সময় দিনারের হিসেবে বিক্রয় করতাম কিন্তু গ্রহণ করতাম দিরহাম; আবার কোন কোন সময় দিরহামের হিসেবে বিক্রয় করতাম কিন্তু গ্রহণ করতাম দিনার। একটির পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করতাম একটির পরিবর্তে অন্যটি দিতাম। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম, তিনি তখন (আমার বোন) হাফসার ঘরে ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার থেকে একটি বিষয় জানতে আগ্রহী। আমি বাকী উপত্যকায় উট বিক্রয় করলে কোন কোন সময় দিনারের হিসেবে বিক্রয় করি কিন্তু গ্রহণ করি দিরহাম; আবার কোন কোন সময় দিরহামের হিসেবে বিক্রয় করি কিন্তু গ্রহণ করি দিনার। একটির পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করি, একটির পরিবর্তে অন্যটি দেই। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন অসুবিধা নেই, তবে (মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে) আজকের মূল্য গ্রহণ করবে। সম্পূর্ণ লেনদেন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পৃথক হবে না।[২৩]

উক্ত দু'টি শর্ত এই ট্রানজেকশনে পূরণ হয় কি?

প্রথম শর্তটি সম্পূর্ণ হয়; কেননা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাৎক্ষণিক উক্ত ঋণের অর্থ কাস্টমারের হিসাব থেকে কর্তিত হয়ে ব্যাংকের হিসাবে জমা হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত পূরণ হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কাস্টমার থেকে আজকের মূল্যের উপর বাড়তি ১.৫% এক্সচেঞ্জ ফি গ্রহণ করে এবং ATM ধারক ব্যাংকে তার একটি অংশ প্রদান করে।

এ জন্য আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় লেনদেন বৈধ না হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় ঃ

১। কার্ডধারীর ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) তার গ্রাহকের হিসাব থেকে আজকের এক্সচেঞ্জ রেটের উপর যে বাড়তি কমিশন কর্তন করে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে গ্রাহক বৈদেশিক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেকিরা) থেকে গৃহীত অর্থ ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানীর ফিস ছাড়া অন্য কিছু প্রদান করতে বাধ্য নন।

২। গ্রাহকের অর্থ থেকে যে অতিরিক্ত অর্থ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক)

কর্তন করে আর তার একটি অংশ ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) গ্রহণ করে এটিও সুদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটি প্রদত্ত ঋণের উপর গৃহীত বাড়তি স্বরূপ।[২৪]

অতএব যদি এ লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাড়তি অর্থ আদায় না করা হয়, গ্রাহকের ব্যাংক যদি দিনারের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে মুদ্রা রূপান্তর করে এবং ATM ধারী ব্যাংক যদি শুধুমাত্র তার থেকে যে পরিমাণ অর্থ উত্তোলিত হয়েছে সে পরিমাণ ফেরত নেয় তবে এ জাতীয় লেনদেন অবৈধ হওয়ার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকে না। আর এ জাতীয় লেনদেনে আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানী মধ্যস্থতার খাতিরে যে পারিতোষিক গ্রহণ করে তাতে কোনো দোষ নেই।[২৫]

উক্ত ট্রানজেকশনের দ্বিতীয় ফিকহী বিশ্লেষণ

কার্ডধারক আমেরিকান ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে যে অর্থ উত্তোলন করলেন তা তিনি নিজেই উক্ত ব্যাংক থেকে কর্জ নিলেন। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রান্ত হয়েছে ঃ

ক) কার্ডধারী ATM-এর মাধ্যমে (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে ১০০ ডলার কর্জ হিসেবে তলব করলে ব্যাংক তার পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার পর তার আবেদন মঞ্জুর করল।

খ) কার্ডবাহক আমেরিকান ব্যাংক থেকে গৃহীত ও ঋণের অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব তার ব্যাংক আল-আমিন ব্যাংকে অর্পণ করল। ফলে আল-আমিন ব্যাংক কার্ডধারীর হিসাব থেকে উক্ত অর্থ আমেরিকান ব্যাংকে পরিশোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত হল।

গ) কার্ডধারকের হিসাব যেহেতু স্থানীয় মুদ্রায় সেহেতু ব্যাংক তার নিজের পক্ষ থেকে (মুয়াককিল বা হিসাবধারকের অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে) মুদ্রা বিনিময় করে তা ডলারে পরিণত করে।

ঘ) মুদ্রা বিনিময়ের ফিস বাবদ কার্ডধারীর হিসাব থেকে কর্তিত অর্থ যার একটি অংশ ATM ধারক ব্যাংক গ্রহণ করল তা মূলতঃ ঋণের উপর শর্তযুক্ত বাড়তি স্বরূপ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এই ট্রানজেকশনের বিধান

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ঃ

১. ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) কার্ডধারী থেকে ঋণের উপর শতকরা হারে যে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করছে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঋণের উপর কোন বাড়তি গ্রহণ করার অধিকার ঋণদাতার নেই।

২. কার্ডধারীর ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) তার গ্রাহকের হিসাব থেকে এক্সচেঞ্জ ফি নামে যে বাড়তি গ্রহণ করছে তার কোন ভিত্তি নেই। কেননা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরের পর (বিনিময় মূল্যসহ) সমুদয় অর্থ গ্রাহকের হিসাব থেকে কর্তন করে বৈদেশিক ব্যাংকে (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কাস্টমার নিজেই যদি তার ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার) উত্তোলন করতেন তবে যে অর্থ কর্তন করা হত তার চেয়ে বাড়তি কোন অর্থ কর্তন বৈধ হবে না।

অতএব যদি এ জাতীয় কোন বাড়তি অর্থ বা শতকরা হারে বিশেষ কমিশন বিলোপ করা হয় এবং কার্ড ইস্যুকারী ও ATM এর স্বত্বাধিকারী ব্যাংক তা গ্রহণ না করে তবে এ জাতীয় লেনদেন বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ATM এর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সৃষ্ট সমস্যার বিধান

কোন কোন সময় ATM যান্ত্রিক বা কারিগরী ত্রুটির কারণে কার্ডধারীর হিসাব থেকে অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় সমস্যার ফিকহী বিশ্লেষণ ও শরয়ী বিধান নিরূপণ করার পূর্বে সমস্যার ধরণ চিহ্নিত করা আবশ্যক।

ATM থেকে নগদ অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিন ধরনের সমস্যা হতে পারে ঃ

১. কার্ডধারী কর্তৃক তলবকৃত সম্পূর্ণ অর্থ তার ব্যাংক হিসাব থেকে কর্তন হয়ে যায়। কিন্তু ATM থেকে কোন ক্যাশ বের হয় না।

২. কার্ডধারী কর্তৃক তলবকৃত সম্পূর্ণ অর্থ তার ব্যাংক হিসাব থেকে কর্তন হয়ে যায় কিন্তু ATM তলবকৃত অর্থের চেয়ে কম অর্থ সরবরাহ করে। যেমন-জনাব "ক" ১০০ ডলার উত্তোলনের আবেদন করলেন, তার হিসাব থেকে ঠিকই ৭০০০ টাকা কর্তন হয়ে গেল কিন্তু ATM তাকে ৮০ ডলার সাপ্লাই দিল।

৩. কার্ডধারী কর্তৃক তলবকৃত সম্পূর্ণ অর্থ তার ব্যাংক হিসাব থেকে কর্তন হয়ে যায় কিন্তু ATM তলবকৃত অর্থের চেয়ে বেশী অর্থ সরবরাহ করে। যেমন "ক" ১০০ ডলার উত্তোলনের আবেদন করলেন, তার হিসাব থেকে ঠিকই ৭০০০ টাকা কর্তন হয়ে গেল কিন্ত ATM তাকে ১২০ ডলার সাপ্লাই দিল।

উপরোক্ত বিভিন্ন অবস্থার বিধান

১. প্রথম অবস্থায় গ্রাহকের হিসাব থেকে তলবকৃত অর্থের সম্পূর্ণ অংশ কর্তন হয়ে যায় কিন্তু ATM কোন ক্যাশ ডেলিভারী করে না, সুতরাং এ লেনদেনটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ অবস্থায় অর্থ বিনিময়কারী দুই পক্ষের এক পক্ষ কোন কিছু গ্রহণ করছে না বরং সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।[২৬] কার্ডধারী উক্ত অর্থের মালিকানা সংরক্ষণ করেন। তার উচিত কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক বরাবর উক্ত অর্থ দাবী করা এবং ব্যাংক

ATM-এর স্বত্বাধিকারী কর্তৃপক্ষ থেকে উক্ত অর্থ কার্ডধারীর হিসাবে ফেরত পাঠানো অথবা নগদ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

২. যদি তলবকৃত সম্পূর্ণ অর্থ তার ব্যাংক হিসাব থেকে কর্তন হয়ে যায় কিন্তু ATM তলবকৃত অর্থের চেয়ে কম অর্থ সরবরাহ করে। তবে ATM যে অর্থ সাপ্লাই দিয়েছে অর্থাৎ ৮০ ডলার তার সমপরিমাণ টাকা (আনুমানিক ৫৬০০) কর্তন বৈধ হবে। এবং বাকী কর্তৃত্ব অর্থ গ্রহণ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মে বাকী অর্থ তার কাস্টমারকে ফেরত দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।[২৭]

৩. যদি ATM তলবকৃত অর্থের চেয়ে বেশী অর্থ সরবরাহ করে তবে লেনদেন সসীহ গণ্য হবে এবং অতিরিক্ত প্রাপ্ত ২০ ডলার কার্ডধারীদের জিম্মায় ব্যাংকের আমানত হিসেবে বিবেচ্য হবে। কার্ডধারকের উচিৎ উক্ত অর্থ ATM ধারক ব্যাংক বরাবর ফেরত দেয়া।[২৮]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যদি অর্থ উত্তোলন সম্পর্কিত এ জাতীয় ত্রুটি একই মুদ্রায় (যে মুদ্রায় ব্যাংক হিসাব উত্তোলন সেই মুদ্রা) হয় তবে ত্রুটির ধরন ও বিধান একই হয়ে থাকে, শুধুমাত্র এ ক্ষেত্র লেনদেনের হুকুম মুদ্রার বিনিময় বিধান না হয়ে ইস্তেফা (অর্থ পরিশোধ) বিধান হবে। আর যদি ATM গ্রাহকের নিজের ব্যাংক না হয়ে অন্য ব্যাংকের অধিভুক্ত হয়ে থাকে তবে সে ক্ষেত্রে ঋণের বিধান প্রযোজ্য হবে।

আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, ব্যাংক কার্ড বর্তমান সময়ের এক জনপ্রিয় আর্থিক লেনদেনের মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ব্যাংক কার্ড বিশেষ করে ক্রেডিট কার্ড সুদ ভিত্তিক হওয়ায় ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। বিশ্বের যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে তাও প্রশ্নবিদ্ধ। সুতরাং একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প ইসলামী কার্ড চালুর বিষয়টি আরো ব্যাপক অধ্যয়ন পর্যালোচনা বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

তথ্যপঞ্জি

১. ড. ওহাবাহা আল-জুহাইলী; বেতাকাতুল ইতিমান, পর্যালোচনা; মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী, মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী, মক্কা আল-মোকাররামাহ, বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা-৬৬০।

২. আল-মাআয়ির আল-শারয়িয়্যাহ, (শরীয়াহ মানদণ্ড), হাইয়াহ আল-মুহাসাবাহ আল-মুরাজায়াহ লিল মুআস্‌সাসাত আল-মালিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, বাহরাইন-২০০৭, মানদণ্ড নং-২, পৃ.-১৮।

-ব্যাংকিং ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত গবেষণা, প্রস্তুতকারী; কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, মুজাল্লা মাজমায়া আল-ফিকহ আল-ইসলামী (বর্ষ-৭/সংখ্যা-১/পৃষ্ঠা-৪৪৮/৪৪৯)।

৩. আল-মা'আয়ির আল-শারয়িয়্যাহ (শরীয়াহ মানদণ্ড), মানদণ্ড নং-২, পৃ.-১৮/১৯।

৪. আল-মা'আয়ির আল-শারয়িয়্যাহ (শরীয়াহ মানদণ্ড), মানদণ্ড নং-২, পৃ.-১৯।

৫. ড. আব্দুস সাত্তার; বেতাকাতুল ইতিমান ওয়া তাকুইফুরা আল-শরয়ী, মাজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী (বর্ষ-৭/সংখ্যা-১/পৃষ্ঠা-৩৬০), ড. মুহাম্মদ আল-কারঈ; বেতাকাতুল ইতিমান, মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী (৭/১-৩৭৮), ড. হাসান আল-জাওয়াহেরী; বেতাকাতুল ইতিমান, মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী (৮/২/৬০৮)

৬. ব্যাংকিং ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত গবেষণা, প্রস্তুতকারী; কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৪)

৭. ড. মুহাম্মদ আল-ক্বারঈ, বেতাকাতুল ইতিমান, মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী (৭/১/-৩৮৯-৩৯০)

৮. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-হাত্তাব আল-মাপায়েবী; মাওয়াহেব আল-জলিল, শরহে মুখতাসার আল-খলিল, দারুল ফিকর, বৈরুত, ২য় প্রকাশ-১৪১২ হিঃ; খন্ড-৫, পৃ.-৯৯। মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-ফুতুমী; মুনতাহা আল-ইদায়াত, দারু আলামুল কুতুব, বৈরুত, (সনবিহীন), খ-২, পৃ.-২৪৮।

৯. ড. হাসান আল-জাওয়াহেরী; বেতাকাতুল ইতিমান, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬০৭।

১০. মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামীর পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ ড. আবদুস সাত্তার, মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী (৭/১/৬৭৫), আল-ফিকহ আল-ইসলামীর পর্যালোচনা, অভিসন্দর্ভ ড. মোস্তফা যারকা, মুজাল্লা মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামী (৭/১/৬৭২)

১১. ড. ফাহাদ আল-রশীদী; লেকচার অন ব্যাংকিং ট্রানজেকশনস ল. ইসলামিক ফাইন্যান্স বিভাগ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ ঃ ২৮/০৫/২০০৮

১২. আল-মা'আয়ির আল-শারয়িয়্যাহ (শরীয়াহ মানদন্ড) নং-২, পৃ.-২৪

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-২০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৪

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-২০

১৬. আল-মা'আয়ির আল-শারয়িয়্যাহ, (শরীয়াহ মানদন্ড), মানদন্ড নং-২, পৃ.-২৪।

১৭. ড. ওয়াহাবা আল-জুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৭৩-৬৭৫

১৮. ড. আব্দুস সাত্তার; প্রাগুক্ত (৭/১/৩৬২); কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস; প্রাগুক্ত (৭/১/৪৬৭); হাসান জাওয়াহেরী; প্রাগুক্ত (৮/২/৬১৫), শরয়ী মানদন্ড নং-২, পৃ.-২৪।

১৯. প্রাগুক্ত, শরীয়াহ মানদন্ড নং-২, পৃ.-২৪।

২০. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, প্রাগুক্ত (৭/১/৪৬৭)

২১. এক্সচেঞ্জ ফিল হাল বিভিন্ন হতে পারে।

২২. ইবনু তাইমিয়া; মাজমু'আ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা, বিশ্লেষণ আবদুর রহমান বিন কাসেম, মাতবাআতে আল-নাহদা আল-হাদীসাহ, ১৪০৪ হি. খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৫১০।

২৩. হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্নে মাজাহ, আহমদ, দারেমী, তাহাভী, দারে-কুতনী, হাকেম, বায়হাকী প্রমূখ বর্ণনা করেছেন। দ্র.-ইবনু তাইমিয়া; মজমু'আ আল-ফাতাওয়া, ২৯/৫১০।

২৪. কেউ কেউ এটাকে কমিশন বা ফিস মনে করতে পারেন। কিন্তু এটি কমিশন বা ফিস হতে পারে না। এই কারণে যে, যেহেতু ঋণদাতা ব্যাংক থেকে যে মুদ্রায় যে পরিমাণে অর্থ ঋণ নেয়া হয়েছে ঠিক সেই মুদ্রায় সে পরিমাণ অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে। সুতরাং এরপর এই বাড়তির শর্তারোপ সুদ বৈ অন্য কিছু হতে পারে না।

২৫. ড. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-ফিকহী লি ইসতেমালি বেতাকা আল-সাররাফ আল-আলী, মাকতাবাতে আল-রুশদ, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, পৃ.-২০।

২৬. যদি চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় কোন কিছু হস্তগত না করে চুক্তির আসর থেকে বিচ্ছিন্ন হন অথবা তাদের একজন গ্রহণ করে এবং অপরজন কিছু গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হন তবে ফকিহগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এই চুক্তির আলোকে তখন একপক্ষের কাছে কোন দাবি রাখে না, বরং যে পক্ষ গ্রহণ করেছে সে পক্ষ গৃহীত বস্তু অপর পক্ষকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। দ্রষ্টব্য; মাসউদ আল-কাসামী আল-হানাফী; বাদায়ে আল-সানায়ে, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত, ২য় প্রকাশ-১৪০২ হি, খন্ড-৫, পৃ.-২১৭।

২৭. ড. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-রবয়ী; আত-তাখরীজ আল-ফিকহী লি ইসতেমালি বেতাকা আল-সাররাফ আল-আলী, পৃ.-২৩।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৪

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ১০১-১০৪

সুপ্রীম কোর্টকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কল্পে নিজের ক্ষমতা নিজেই প্রয়োগ করতে হবে

এড. এ. কে. এম. বদরুদ্দোজা

আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল ১১৬তে অধঃস্তন আদালতের উপর সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে, বস্তুত সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। মাসদার হোসেন বনাম সরকার মামলায় আপীল বিভাগ সরকারকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের নির্দেশ দেয়। এর বড় অনুসঙ্গ ছিলো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের স্থলে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ কল্পে সুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন, বেতন ভাতার জন্য জুডিশিয়াল পে-কমিশন, সুপ্রীম কোর্টের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সুপ্রীম কোর্ট অধঃস্তন আদালতসমূহ নিয়ন্ত্রণ, দেখভাল ও তদারকীর জন্য একটি সচিবালয় গঠন করা। কিন্তু এ ধরনের কোন সচিবালয় গঠন না করেই ৯৬-২০০১ সনে আওয়ামী লীগ-সরকারের আমলে প্রথমে সুপ্রীম কোর্টকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। এরপর ২০০১-২০০৬ মেয়াদে ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে পর্যায়ক্রমে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন, জুডিশিয়াল পে-কমিশন গঠন করা হয়। ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচারবিভাগ পৃথকীকরণের চূড়ান্ত পর্বটি সম্পন্ন করে। ১লা নভেম্বর ২০০৭ থেকে তা কার্যকর হয়। পৃথকীকরণের পর সুপ্রীম কোর্টের অবস্থা দাড়ায় সংসার থেকে আলাদা করে দেয়া অপরিণত শিশুর মতো। পৃথকীকরণের পর সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা কে প্রয়োগ করবেন? প্রধান বিচারপতি নাকি ফুলকোর্ট? পক্ষান্তরে অধঃস্তন আদালতের উপর নিয়ন্ত্রণ দেখভাল ও খবরদারির ক্ষমতা সংবিধান দিয়েছে হাইকোর্টকে। সেই ক্ষমতা কিভাবে প্রযুক্ত হবে। এখন পর্যন্ত বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব প্রধান বিচারপতির একক এখতিয়ারাধীন। সংবিধান এ ধরনের একক কর্তৃত্বের কথা বলে না। সেখানে অধঃস্তন আদালতের উপর হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ ও খরবদারির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অধঃস্তন আদালতের উপর কর্তৃত্বসহ সামগ্রিক বিষয়টিই সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সামষ্টিকভাবে প্রযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতির কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হচ্ছে। নির্বাহী বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর

লেখক : গবেষক ও শিশু সংগঠক, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

একাধিপত্য যেমন ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছে, একইভাবে বিচার বিভাগে প্রধান বিচারপতির একক কর্তৃত্ব পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। পৃথকীকরণের পর হাইকোর্টে দুই দফায় বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথম দফায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৬ জন বিচারপতিকে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সম্ভাব্য বিচারপতিদের তালিকা তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয় আইন উপদেষ্টার উপর। এর মাধ্যমে বল নির্বাহী বিভাগের কোর্টে ঠেলে দেয়া হয়। আইন উপদেষ্টা হাসান আরিফের তালিকা থেকে ছয়জনকে হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। এটি ছিল পৃথকীকরণের পর প্রথম বিচারপতি নিয়োগ। অভিযোগ উঠে ছয়জনের মধ্যে তিনজনই ছিলেন আইন উপদেষ্টার ল' ফার্মের এসোসিয়েটস। তাদের ব্যক্তিত্ব ও পেশাগত দক্ষতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলেননি। কিন্তু বিচারপতি নিয়োগের ধারাটা যে আসলেও বদলায়নি তা সকলের কাছেই প্রতিভাত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম পর্যায়ে রীট মামলার মাধ্যমে পুনর্বহালকৃত ১০ বিচারপতি হাইকোর্টে নতুন করে নিয়োগ লাভ করেন। তারা পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পেলেও ৪ দলীয় জোট সরকার ২ বছর পূর্তির পর স্থায়ী না করায় বাদ পড়েন। এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়েন আইন পেশায়। অন্যদিকে চালিয়ে যান আইন লড়াই। এদের নিয়োগ দান প্রক্রিয়া শেষে নতুন করে আরও ৮ জনকে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয়। এবার আর প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে কোন বৈঠকের কথা শোনা গেলো না। তালিকাটা কে বানালেন সে খবরও ছাপা হলো না। কিন্তু নাম প্রকাশের পর দেখা গেলো পেশাগত যোগ্যতা ও মানের বিচার ছাপিয়ে তাদের বড় পরিচয় তারা আওয়ামী ঘরানার। জেলা জজ কোটা থেকে শীর্ষ স্থানীয়দের ডিঙিয়ে নেয়া হলো তুলনামূলক জুনিয়রদের। আর আইনজীবির কোটায় নেয়া হলো এমনও লোককে যারা কখনো হাইকোর্টে প্রাকটিস করেননি বা আইন পেশায় সাময়িক বিরতি দিয়ে চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা অযোগ্য অদক্ষ এ কথা বলবো না। কিন্তু তারা সেই পুরনো কায়দায় দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছেন। পৃথকীকরণের পরও বিচার বিভাগ তা রোধ করতে পারেনি। এ অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। সুপ্রীম কোর্ট যদি প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুসংহতভাবে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ না করে রাজনৈতিক সরকারের ইচ্ছাপূরণ করে তা মেনে নেয়া যায় না। সুপ্রীম কোর্টকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হতে হবে। অবিলম্বে সুপ্রীম কোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তাহলে সম্ভাব্য বিচারপতির তালিকা প্রণয়নের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের শরণাপন্ন হতে হবে না। পাশাপাশি বিধি প্রণয়ন অধঃস্তন আদালতের তদারকী, বিচারকদের বদলী, প্রমোশন প্রশিক্ষণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়াদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। অন্যথায় সুপ্রীম কোর্টের অবস্থা 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই' নিধিরাম সর্দার-এর মতোই থেকে যাবে।

রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ সমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২ অনুযায়ী রাষ্ট্রের। এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ এবং নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব অপরিসীম। নির্বাহী বিভাগ পৃথকীকরণের পরও বিচার বিভাগের উপর নজরদারী ও খবরদারী যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকার জেলার জজ ও গাজীপুরের জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারকের বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং পরে তা প্রত্যাহারের মাধ্যমে পানি অনেক ঘোলা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। সম্প্রতি ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে চার দলীয় জোট সরকার এবং সেনা সমর্থিত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে আনীত ফৌজদারী মামলা সমূহ প্রত্যাহারের হিড়িক পড়েছে। এ বিষয়ে ও সুপ্রিম কোর্টের মতামত বা পরামর্শ নেয়া হয়নি। অতি সম্প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রাষ্ট্রের পক্ষে পুলিশের পরিবর্তে সরকারী কৌসুলীদের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও সুপ্রীম কোর্টের কোন পরামর্শ মতামত বা দিক নির্দেশনা নেয়া হয়নি। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার জেলা জজ ও চীফ ম্যাট্রোপলিটন চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব নির্বাহী বিভাগের উপর ন্যাস্ত করার পাঁয়তারা করছে। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পূর্ব থেকেই এ ধরনের কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব পালন করতেন জেলা জজ/চীফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট। সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় দলীয় লোকজনের নিয়োগ নিশ্চিত করতে না পেরে ক্ষমতাসীন দলের ক্ষুব্ধ লোকজন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করায় সরকার আইন মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে অধঃস্তন সকল আদালতে সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের উদ্যোগ নিচ্ছে। অন্যদিকে বিচার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত নির্বাহী বিভাগের চাপে পড়ে সরকার মোবাইল কোর্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছে। উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী প্রমাণ করে সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয়টি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। ছলে বলে কৌশলে বিচার বিভাগের বিষয়ে নাগ গলানোর প্রয়াস চলছে। ফলে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিচার বিভাগের এখতিয়ারাধীন বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে যা অনভিপ্রেত।

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলাকে বিচারক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেকে মানব জাতির অন্তিম দিনের বিচারক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি কেবল বিচারকই নন, ন্যায় বিচারের আঁধার। আল্লাহর খলিফা বা দূত হিসাবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে যেনতেন ভাবে দায়সাড়া গোছের বিচার নয় বরং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। ন্যায় বিচার নিশ্চিতকল্পে বিচার বিভাগের

পৃথকীকরণই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন দৃঢ় নৈতিক এবং সাহসীকতা পূর্ণ অবস্থান। কেবল পৃথকীকরণের বটিকায় বিচার বিভাগকে পরিপূর্ণ স্বাধীন ও আত্ম মর্যাদাশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা যাবে না। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের কর্ণধারদের তথা বিচারকদের নৈতিক শক্তি বলে বলীয়ান হতে হবে। সে জন্য তাদের সর্বাগ্রে সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য সব মেকি ক্ষমতাবান, দল, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করতে হবে। সংসদ, সরকার উত্তরপাড়া, রাজনৈতিক দল বা মিডিয়ার দিকে তাকিয়ে ন্যায় বিচারের গুরু দায়িত্ব পালন করা যাবে না। যে সব বিচারক এসব ভয় ভীতি ও প্রভাব প্রতিবন্ধকতার উর্ধ্বে উঠতে পারবেন তাদের জন্য বিচার কার্য পরিচালনার পথ হয়ে উঠবে সীরাতুল মুস্তাকিম। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কল্পে সুপ্রীম কোর্ট ও এর বিচারকদের এভাবেই নৈতিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে নিজেদের ক্ষমতা আইনানুগ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ১০৫-১১৯

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস-৫

নবী-রসূলদের যুগ ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান

হযরত ইসমাঈল আ.

হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর জাতির অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে দীন প্রচার করতে মনস্থ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেনঃ "إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন"।[১] অতপর তিনি 'বাবেল' থেকে বের হয়ে ফুরাত নদীর পশ্চিমতীরের কাছাকাছি 'উর' নামক স্থানে হিজরত করেন। পরে সেখান থেকে মিসরে গমন করেন। তার স্ত্রী 'সারা' বন্ধ্যা ও নিঃসন্তান ছিলেন। মিসরের রাজকন্যা 'হাজারের' সাথে বিয়ের পর তিনি সিরিয়া গমন করেন, বায়তুল মাক্দাসের নিকট অবস্থানের সময় তিনি সৎ সন্তানের জন্য দু'আ করেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 'হে আমার রব আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন' (সূরা আস্সাফ্ফাত ১০০)।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ।[২] অতপর আল্লাহ বলেন 'আমি তাঁকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম

যমযম কূপের মাধ্যমে পানির ব্যবস্থা ও মানবতার কল্যাণ সাধন

ইব্ন আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আ. মক্কার জন-মানবহীন বিরান ভূমিতে তার স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈলের জন্য যে যৎসামান্য পানি রেখে গিয়েছিলেন তা ফুরিয়ে যাওয়ার পর হযরত 'হাজার' রা. পানি সংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে শেষে নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছুটাছুটির সময়ে মারওয়া পাহাড় থেকে একটি অদৃশ্য আহবান শুনতে পান এবং বর্তমানে যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশতা দেখতে পান। ফেরেশতার পদাঘাতে মাটির অভ্যন্তর হতে পানির উৎস নির্গত হলো। হযরত হাজার রা. এর চার পার্শ্বে

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আইল বেঁধে একে কূপের রূপদান করলেন।[৩]

মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. এর দু'আ কবুল করে জনমানবহীন বিরান ভূমিতে মানববসতি ও যমযমের পানির ব্যবস্থা করে শান্তিপূর্ণ একটি নিরাপদ আবাসনে পরিণত করেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هذَا بَلَدًا أمِنًا وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ امَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ ضْطَرُّهُ إِلى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (سورة البقرة)

'এটাও স্মরণ কর যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিলেন, ওহে আমার রব! এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগর বানিয়ে দাও। এবং এর অধিবাসীদের মাঝে যরা আল্লাহ ও পরকালকে মানে তাদেরকে সকল প্রকার ফলের রেযেক দান করো।' আল্লাহ বললেন, যে-কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিবো। অতপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম। স্মরণ করো যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলেছিল, তখন তাঁরা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। ওহে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত তৈরী করো। আমাদেরকে তোমার ইবাদত পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ওহে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এমন এক রসূল প্রেরণ করো, যে তোমর আয়াত সমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ১২৬-১২৯)। মহান আল্লাহ দুনিয়ায় মানব

সভ্যতার জন্য উক্ত যমযম কূপকে কেন্দ্র করে, ইবরাহীম, ইসমাঈল ও মা হাজারের নিষ্ঠা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিবেদিত হওয়ার উসীলায় এমন বরকত দান করেন যে, অতি অল্প কালের ব্যবধানে মক্কার বিজন প্রান্তর মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবের একটি আদি গোত্র 'জুরহুম' হযরত হাজার রা. এর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে যমযম কূপের পার্শ্বে বসতি স্থাপন করে এবং হযরত ইসমাঈল আ. যৌবনে পদার্পণ করে এ গোত্রে বিয়ে করেন। পরবর্তী সময়ে এই কা'বা গৃহকে আল্লাহ দুনিয়ার সকল মুসলিম উম্মার মিলন কেন্দ্রে পরিণত করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ .... (سورة الحج)

'এবং তুমি (হে ইবরাহীম) মানুষের জন্য হজ্জের ঘোষণা দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্ব প্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে।[৪]

অতএব যমযম কূপ কা'বার চত্বরে অবস্থিত হওয়ায় এটা একটি কল্যাণময় মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় স্থান এবং এর পানি মানুষের জন্য বরকত পূর্ণ। দুগ্ধপোষ্য নবী-ইসমাঈল এর জীবন তো এই পানি দ্বারাই সঞ্জীবিত হয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ.

'পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি হলো যমযমের পানি'।[৫]

ইব্‌ন আব্বাস রা. মহানবী স.-এর বাণী উল্লেখ করে বলেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা পূর্ণ হবে। কেউ যমযমের পানি রোগমুক্তির জন্য পান করলে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করবেন এবং পিপাসা নিবারণের জন্য পান করলে আল্লাহ তাকে পিপাসা মিটাবেন। ইহা জিবরীল আ.-এর পদাঘাতে ইসমাঈল আ.-এর পানীয় হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে।[৬]

একই কথা মুজাহিদ (র)-এর নিজস্ব বক্তব্য হিসেবেও উদ্ধৃত হয়েছে। তবে তাতে আরও আছে ঃ তুমি যমযমের পানি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পান করলে আল্লাহ তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন।[৭]

হযরত আবুযর গিফারীর রা. ইসলাম গ্রহণ সময়কার অবস্থায় তাঁর উপর কুরাইশদের অত্যাচার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে "আবুযর গিফারী রা. মহানবী স. এর নবুওয়ত লাভের সংবাদ জানতে পেরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে মক্কায় আগমন করেন। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে মক্কার কুরায়শ

মুশরিকরা তাঁকে প্রস্তর নিক্ষেপে জর্জরিত করে বেহুঁশ করে ফেলে এবং তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। হুঁশ ফেরার পর তিনি যমযমের নিকট গিয়ে দেহের রক্ত ধুয়ে ফেলেন এবং যমযমের পানি পান করেন। তিনি মহানবী স.-এর সাথে সাক্ষাতের আশায় কা'বার চত্বরে ত্রিশ দিন (বর্ণনান্তরে পনের দিন) অতিবাহিত করেন। এ সময় যমযমের পানি ব্যতীত তাঁর অন্য কোন খাদ্য বা পানীয় ছিল না। তিনি তা পান করে সুস্বাস্থ্য লাভ করেন, এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও ক্ষুধা অনুভব করেননি। তার সাথে সাক্ষাতের পর রসূলুল্লাহ সা. তার এ কয়দিনের খাদ্য-পানীয়ের খবর নিলে তিনি বলেন যে, যমযমের পানি ছাড়া আর কিছুই তার পেটে প্রবেশ করাননি এবং এতেই তিনি সুস্বাস্থ্য লাভ করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এই পানি ক্ষুধার সময় খাদ্যের অভাব পূর্ণ করে।[৮]

যমযম কূপের বরকতেই ধূসর মরুতে মানব বসতি গড়ে ওঠে। যতবার মহানবী স.-এর (شَقُّ الصَّدْرِ) বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়েছে ততবার তার কলব এই কূপের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। তিনি সুযোগ পেলেই এই কূপের পানি পান করেছেন ও অন্যদেরকে ও পান করতে উৎসাহিত করেছেন।[৯]

হযরত ইসমাঈলের চরিত্র ও কর্ম

হযরত ইসমাঈল কৈশোরেই মহান আল্লাহর পরিচয় পান ও তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তাঁর ইবাদতের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এমন সংবাদ দেয়া হয়েছে যা ইতিহাসে বিরল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَابُنَىَّ إِنِّىْ أَرى فِىْ الْمَنَامِ أَنِّىْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَاى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ.

'অতপর সে (ইসমাঈল) যখন তার পিতার সাথে কাজ করবার বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বললো, বৎস। আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। অতএব তোমার অভিমত কি? সে বললো, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'[১০]

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও উন্নতি সাধনে হযরত ইসমাঈল আ. এর চারিত্রিক গুণাবলী ও তৎপরতা পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি ছিলেন পরম ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী, সত্যিকার মুখ্‌লিস বান্দাহ এবং পিতা-মাতার একান্ত অনুগত। তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে ছিলেন অতীব নিষ্ঠাবান। মহান আল্লাহর হুকুম আহকাম ও বিধি নিষেধ নিজ জীবনে মেনে চলতে যেমনি অভ্যস্থ ছিলেন, তদ্রুপ পরিবারের

সদস্যগণকেও বিশেষভাবে সালাত ও যাকাত আদায়ে গুরুত্বের সাথে তাগিদ দিতেন এবং তাঁর নির্মল চরিত্র ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনের জন্য তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর সন্তোষভাজন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

'স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূলও নবী। তিনি তার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর রবের সন্তোষভাজন।'[১১]

হযরত ইসমাঈল আ. দীন প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে পরিবার পরিজনকেও গুরুত্ব দেন এবং মহান আল্লাহর বিধান পালন করার নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর জাতির নিকট সত্যের পয়গাম পৌছিয়েছেন, সকল নবীর মতই হযরত ইসমাঈল আ. ও তাঁর হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করেছেন। আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবনে মহান আল্লাহর আনুগত্য ঠিকমত কার্যকরী করার চেষ্টা নিয়মিত করেছেন। নিজ পরিবারের লোকজন মহান আল্লাহর ইবাদত কার্যকরী করে তাঁর রঙ্গে রঞ্জিত হলে সমাজের অন্য লোকদেরকে দাওয়াত দান করা খুবই সহজ হয়ে যায়, তখন সমাজে একটি দীনি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর দীনি পরিবেশের মাধ্যমেই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করে নবীগন আল্লাহর দীন কায়েম করেছেন।

হযরত ইসহাক আ.

নমরুদের অগ্নিকুণ্ড হতে মুক্তি লাভের পর হযরত ইবরাহীম আ. ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত আ. সহ স্বীয় পরিবার পরিজন নিয়ে দেশ ত্যাগ করে ইরাকের বাবেল শহর হতে বের হয়ে সিরিয়া চলে আসেন। পরে তিনি ফিলিস্তিনের কান'আন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[১২]

দীর্ঘকাল কান'আনে অবস্থান কালেই তাঁর প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান হযরত ইসহাক জন্ম গ্রহণ করেন। তখন হযরত ইবরাহীমের বয়স ছিল একশ বছর এবং হযরত সারার বয়স ছিল নব্বই বছর।[১৩]

ইসহাকের জন্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আয়ালা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.

'আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দান করেছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ।'[১৪]

হযরত ইসহাক আ. কে নবুওয়াতী দায়িত্বশীল করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন; وَبَشَّرْنَاهُ

بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ 'আমি তাকে (ইবরাহীমকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের; সে ছিল একজন নবী, সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত"।[১৫]

শৈশব থেকেই হযরত ইসহাক পিতার সাথে ফিলিস্তিনের হেবরন নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[১৬] হযরত ইবরাহীম আ. ইসমাঈল আ.কে মক্কায়, হযরত ইসহাক আ.কে ফিলিস্তীন ও হযরত লূতকে সাদুম অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তারা আল্লাহর দীনের দাওয়াত দান ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হন। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও উন্নতির পথে তাদের অবদান ছিল ঐতিহাসিক। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দান করার কথা ঘোষণা করেছেন "আমি তার বংশধর وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ-দের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দান করেছি।'[১৭]

দুনিয়ায় আল্লাহর দীনের পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ. এর দুইপুত্র হযরত ইসমাঈল আ. ও হযরত ইসহাক আ. এবং তাদের বংশধরদের মধ্যেই পরবর্তী সকল নবী ও রসূলকে পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর। হযরত লূত আ. ছাড়া অন্য সকল নবী ছিলেন হযরত ইসহাক আ. এর বংশধর।[১৮]

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসহাক আ.-কে স্বীয় পিতা ইবরাহীম আ. ও স্বীয়পুত্র ইয়াকুব আ.-এর সংগে বহুমুখী অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন। তিনি তাদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ, মানব জাতির নেতা, পথ প্রদর্শক ও ইবাদত প্রিয় বান্দাহ হিসেবে উল্লেখ করেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِيْنَ. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

'এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছি ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব, আর তাদের প্রত্যেককেই করেছি সৎকর্মপরায়ণ। আমি তাঁদেরকে করেছি নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। আমি তাদের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি সৎ কর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। তাঁরা আমারই ইবাদতকারী ছিল।'[১৯]

অর্থাৎ দুনিয়ায় মানব জাতিকে মহান রব্বুল আলামীনের পরিচয় দান করা, তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দান করা, জীবনের সকল বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম আহকাম,

বিধি-নিষেধ কার্যকরী করার জন্য তাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে মোতাবেক হযরত ইসহাক আ. তাঁর জাতির লোকদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে সকলকে সালাত জামায়াতের সাথে আদায়ের ব্যবস্থা করা, অনুগত জীবন যাপন করা, অর্থনৈতিক জীবনে ফকীর, মিসকীন, এতিম বিধবা ও অভাবগ্রস্তের দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পালন করেছেন। লোকদের মাঝে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল বিষয়ে ফায়সালা করার ব্যবস্থা করেছেন।

হযরত ইয়াকূব আ.

হযরত ইয়াকুব আ. ছিলেন হযরত ইসহাক আ. এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম আ. এর পৌত্র, মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً.

"আমি ইবরাহীমকে ইসহাক দান করেছিলাম এবং অতিরিক্ত পৌত্র রূপে ইয়াকূব।" (সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৭২)। হযরত ইয়াকূবের মাতার নাম ছিল রিফকা, শৈশবে মাতা ইয়াকুবকে নিজ ভ্রাতা লাভীন" এর নিকট হাররান (বর্তমান উত্তর মেসোপটামিয়া) এ পাঠান। মামার বাড়ীতে যাওয়ার পথে রাত্রে তিনি একটি গুরুত্ব পূর্ণ স্বপ্ন দেখতে পান। স্বপ্নের বিষয় বস্তু ছিল এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর নিকট অহী পাঠালেন ঃ 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তোমার ইলাহ, তোমার পূর্বপুরুষগণের ইলাহ। আমি তোমাকে এই পবিত্র ভূমির (ফিলিস্তিন) উত্তরাধিকারী বানালাম এবং তোমার পরে তোমার বংশধরগনকেও। আমি তোমাকেও তাদেরকে প্রাচুর্য দান করলাম। এ স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত আমি তোমার সাথে আছি এবং আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলাম। তুমি এখানে একটি ঘর বানাও যাতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ আমার ইবাদত করবে। ইটাই বায়তুল মাকদিস।'[২০]

ইয়াকুব আ. মামার বাড়ীতে পৌছে তাঁর পশু লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে পরবর্তী সময়ে তাঁর চার স্ত্রীর গর্ভে আল্লাহ তা'আলা বার পুত্র ও এক কন্যা সন্তান দান করেন। ইয়াকুব আ. এর উসীলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর মামার সম্পদে, বিশেষভাবে গবাদি পশুতে প্রচুর বরকত ও প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মোট বিশ বছর মাতুলালয়ে অবস্থান করেন। পরে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইয়া'কুব আ. কে তাঁর পিতৃ ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী তিনি সপরিবারে প্রচুর সম্পদাদিসহ পিতৃভূমি "হেবরনে" ফিরে আসেন।[২১]

আল-কুরআনের বর্ণনা মতে হযরত ইয়াকূব আ. আল্লাহর একজন সম্মানিত মহান পয়গম্বর ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে "কানআ বাসীদের মধ্যে আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং এখানেই তিনি

জীবনের অধিকাংশ দীন-ইসলামের প্রচার করেন।[২২]

মহান আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নবী- রসূলগণের প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা, এমর্মে আল্লাহর ঘোষণা হলোঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِىْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسى وَعِيْسى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا.

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন নূহকে। হে নবী তার বিষয়েই আপনার নিকট আমি ওহী নাযিল করেছি, ঐ একই বিষয়েই নির্দেশ দিয়েছি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে, আর তা হলো, তোমরা আল্লাহর দীন কায়েম কর, এ ব্যাপারে কোন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না।'[২৩]

এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হযরত ইয়াকূব আ. এর প্রচেষ্টার ফলে 'কানআন' এলাকায় পৌত্তলিকতার অবসান ঘটে এবং জনগণ দীন ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে এই এলাকা মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ইয়াকূব আ. এখানে আল্লাহর ঘর বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেন। এ প্রেক্ষিতে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ যার গিফারী রা. বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

يارسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولا قال المسجد الحرام قال ثم أي قال المسجد الأقصى قال كم كان بينهما قال أربعون سنة.

'হে আল্লাহর রসূল! পৃথিবীতে সর্ব প্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়? তিনি বলেন, মাসজিদুল হারাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অতপর কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদুল আকসা, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুই মসজিদ নির্মাণের মধ্যে ব্যবধান কত ছিল? তিনি বলেন ৪০ বছর।'[২৪]

হযরত ইয়াকূব আ. সহ সকল নবীর দীন ছিল ইসলাম

ইতোপূর্বের আলোচনায় আমরা পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরার ১৩নং আয়াতের নির্দেশনায় জানতে পেয়েছি যে, এ দুনিয়ায় মহান আল্লাহ তাঁর দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য সকল নবী ও রসূলকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। সে মোতাবেক সকল নবী-রসূল যখনই যে এলাকায় এসেছেন তখনই সেখানে মানব জাতির নিকট ঐ একই দীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের সকল কিছু উৎসর্গ করেছেন।

হযরত ইবরাহীমের পরবর্তী যুগে লোকজন তাদের নবী- রসূলদের দেয়া বিধান ইসলামকে বিকৃত করে নিজেদেরকে ইসলামের বাইরে অন্য ধর্মের ধারক বাহক বলে দাবী করলে মহান আল্লাহ তা নাকচ করে দিয়ে বলেন,

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না; তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।২৫

হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইয়াকূব আ. তাদের বংশধরকে একই দীন ইসলামকে আমৃত্যু আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

এবং ইবরাহীম ও ইয়া'কূব এ সম্পর্কে তাঁদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা আমৃত্য মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করবে।২৬

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার সকল মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের একমাত্র শান্তিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ দীন হলো একটিই, আর তাহলো ইসলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

অবশ্যই আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন-যাপনের পথ হলো ইসলাম।২৭

এমনকি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ-পন্থা, ধর্ম তথা জীবন যাপনের বিধান হিসেবে গ্রহণ করলে তা পরিত্যায্য তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধানকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে তা আল্লাহ কখনই গ্রহণ করবেন না, সে অবশ্যই আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।২৮

বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুলোক শত্রুতা পোষণ করেই আল্লাহর কালামকে বিকৃতি সাধন করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَه مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তারা তা হৃদয়ঙ্গম করার পরও সজ্ঞানে এর বিকৃতি সাধন করে।২৯

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه.

ইয়াহুদীদের মধ্যে কতকলোক (আল্লাহর) কালামকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে।৩০

তারা এতটা দুঃসাহস দেখিয়েছে যে, নিজেদের পক্ষ হতে মনগড়া কিছু রচনা করে তা আল্লাহর কিতাবের অংশ বলে চালিয়ে দিয়েছে, তা বর্ণনা করে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِه ثَمَنًا قَلِيْلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ.

অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ-মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, এটি আল্লাহর নিকট হতে। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য রয়েছে তাদের ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের ধ্বংস অনিবার্য।৩১

দুনিয়ার সকল মানব বসতিপূর্ণ এলাকায় আল্লাহ্ নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। তার বিধান শিক্ষা দেয়া ও মানুষের জীবনের প্রতিটি বিভাগে উক্ত দীন বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীল করেছেন সকল নবীরসূলকে। এজন্যই সকল নবী-রসূলের জীবন যাপনের বিধান একটিই আর তা হলো ইসলাম। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ সহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা আল্লাহর কালামকে বিকৃত করে বিভিন্ন ধর্ম তৈরী করে নিয়েছে।

হযরত ইয়াকূবের মিসর গমন ও দাওয়াতী কাজ

হযরত ইয়া'কূব আ. তার পুত্র ইউসুফের আহবানে সাড়া দিবার জন্য কানআন (ফিলিস্তীন) থেকে সপরিবারে মিসর গমন করেন। সেখানে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া পুত্র ইউসুফ ও অতিপ্রিয় কারারুদ্ধ পুত্র বিনয়ামীনের সাক্ষাৎ

লাভ করেন। পুত্রের শোকে কাঁদতে কাঁদতে ইয়া'কূব তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। এর আগেই ইউসুফ আ. নিজের জামা খুলে ভাইদের হাতে দিলেন এবং পরিবারের সকলকে সহ পিতাকে মিসরে নিয়ে আসতে বললেন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هذَا فَاَلْقُوْهُ عَلى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِى بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও। তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পারেন। আর পরিবারের সবাইকেই আমার নিকট নিয়ে এসো।"[৩২]

ইয়া'কূব আ. এর আদেশ মুতাবিক তারা জামা নিয়ে কানআনের উদ্দেশে মিসর ত্যাগ করলো। একদিকে কাফেলা মিসরের শহরতলী অতিক্রম করছিলো, আর অপর দিকে কান'আনে ইয়া'কূব আ. উপস্থিত পৌত্র-পৌত্রী ও পরিবারের অন্য লোকদেরকে ডেকে বলতে লাগলেন,

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلاَ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ.

'অতঃপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়লো, তখন তাদের পিতা (ইয়াকূব) বললেন, তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না করো তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি'।[৩৩] কাফেলা পৌছার সাথে সাথে ইউসুফ আ. এর নির্দেশমত ইয়াকূব আ.-এর মুখমন্ডলের উপর তার জামাটি রাখা হলে। তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। পুত্ররা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে ইয়া'কূব আ. দু'আ করবার ওয়াদা করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَمَّاَ اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقهُ عَلے وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ. قَالُوْا يَابَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ. قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ رَّحِيْمُ.

'অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো এবং তার মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখলো যখন সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল। সে বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আমি আল্লাহর নিকট হতে জানি যা তোমরা জান

না। তখন সকলেই বলে উঠলো, আপনি আমাদের পাপ ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। আমরা সত্যিই অপরাধী। সে বললো, আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করবো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'[৩৪]

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে হযরত ইয়াকূব আ. মিসরে আগমনের পর সেখানে ১৭ বছর জীবিত ছিলেন।[৩৫] এই সময় কালে পিতা-পুত্র মিসরে ব্যাপক ভিত্তিতে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করেন। ফলে সংখ্যা গরিষ্ঠ মিসরবাসী ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইয়া'কূব আ. এখানে জীবনের বাকী সময়টুকুর পুরোটাই দীনি দাওয়াতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেন। যার প্রভাবে দীর্ঘদিন যাবত উক্ত এলাকায় আল্লাহর দীনের বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হযরত ইয়া'কূব আ. তাঁর অন্তিম সময়ে তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে তাওহীদকে মেনে চলা ও দীনের বিধানকে আমৃত্যু আঁকড়ে ধরার জন্য নসিহত করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

'এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাঁদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, হে পুত্রগণ আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা আমৃত্যু মুসলমান থাকবে।'[৩৬]

বনী ইসরাঈল জাতির পূর্বপুরুষগণ তাঁদের আদী পিতা ইয়া'কূব আ. এর নিকট ওয়াদা করেছিল যে, তাঁরা তাঁদের জীবনে একমাত্র ইসলামকেই মেনে চলবে যে পথে পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। আল্লাহর তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ.

'ইয়াকূবের যখন মৃত্যু সময় হয়েছিল তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন তার পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তখন তারা বললো, আমরা আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ-এর ইবাদত করবো। তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁর নিকট আত্ম-সমর্পনকারী।[৩৭]

অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে"

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَلَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.

'হে লোকেরা, তোমরা শরীক বিহিন এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দাও; আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামকে তাঁর বান্দাহ ও রাসূল বলে মেনে নাও' বলে লোকজনকে আহ্বান করলেন এবং এটাই ইবরাহীম আ. এর একনিষ্ঠ ধর্ম (দীনে হানীফ), তখন ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা দাবী করলো যে, তারাই ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের অনুসারী। শুধু তাই নয়, ইয়াহূদী-খৃষ্টানরা দাবী করলো যে, তোমাদের ও আমাদের মত নতুন ধর্ম-ইসলাম ত্যাগ করে আমাদের অনুসরণ করা উচিৎ, এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব আ. ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী-খৃষ্টান ছিল বলে দাবী করলো। তাই মহান-আল্লাহ ঘোষণা করলেন,

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ إِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْنَصرى قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ

'তোমরা কি বলো, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান ছিল? (হে রসূল) আপনি বলুন, তোমরা কি বেশী জান না আল্লাহ?"[৩৮]

উল্লেখিত আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী- খৃষ্টানদের উপরোক্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করে আসল সত্যি তুলে ধরেছেন। আয়াতে প্রদত্ত প্রশ্নাকারে প্রতিবাদের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য দু'টি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

(এক) ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মের বর্তমান যে কাঠামো তা পরবর্তী কালের সৃষ্টি। ইয়াহূদী ধর্মের নামকরণ, এর ধর্মীয় বিশেষত্ব, অনুষ্ঠানমালা ও নিয়ম-কানুন খৃষ্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ শতাব্দীতে রূপ লাভ করেছে। অনুরূপ ভাবে যেসব ধারণা-বিশ্বাস ও বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সমষ্টিকে খৃষ্টবাদ বলা হয় তা হযরত ঈসা আ.-এর বহু পরবর্তী কালে উদ্ভাবিত হয়েছে। সুতরাং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরের ইয়াহূদী বা খৃষ্টান হবার দাবী অসার কল্পনামাত্র।

(দুই) ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের নিজস্ব ধর্মীয় গ্রন্থাবলী হতেও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আ. সহ উক্ত নবীগণ এক আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত, উপাসনা আনুগত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকেও অংশীদার করতেন না। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদ উভয়ই পূর্বোক্ত নবীগণের আচরি চিরসত্য পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে।[৩৯]

হযরত ইউসুফ আ.

পুত্র-কন্যা সমেত ইয়াকূব আ. এর সন্তানের সংখ্যা ছিল তেরজন। এদের মধ্যে হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন (ভাই-বোন সম্মিলিত হিসেবে দ্বাদশ এবং শুধু ভাইদের মধ্যে) একাদশ। একমাত্র দ্বাদশ ভাই বিনয়ামীন ছিলেন

ইউসুফ আ.-এর সহোদর এবং অন্য সকলে ছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। ইয়া'কূব আ.-এর প্রথম পত্নী লায়্যা বিন্‌ত লায়্যানের গর্ভজাত এবং তার মৃত্যুর পর ইয়াকুব আ. লায়্যার ভগ্নী রাহীলকে বিবাহ করলে তার গর্ভে ইউসুফ ও বিন য়ামীন নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। ইউসুফের শৈশবে বিন য়ামীনকে প্রসব কালে তাদের মাতা রাহীলও ইনতেকাল করেন।[৪০]

উল্লেখ্য যে, ইউসুফ আ.-এর এই এগার ভাই তথা ইয়া'কূব আ. এর বার সন্তানের বংশধররা পরবর্তীকালে পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য জাতিতে পরিণত হয় এবং তারা অদ্যাবধি ইয়াহুদী ও বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। হযরত ইয়াকূব আ.-এর অন্য নাম ইসরাঈল অনুসারে তাদেরকে বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয় এবং ইয়াকূব আ.-এর ওফাতের পরে তাঁর ওসিয়ত অনুসারে বংশীয় নেতৃত্ব কর্তৃত্ব হযরত ইউসুফ আ. কে প্রদত্ত হয়।

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা আসসাফফাত ঃ ৯৯।
২. সূরা আসসাফফাত ঃ ১০১।
৩. সহীহ আল-বুখারী, বাংলা অনুবাদ, খঃ-৩ পৃ. ৩৫৭-৮, হাদীস বাং-৩১১৪
৪. সূরা আল হাজ্জ ২৭-২৮।
৫. সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬৫।
৬. আযরাকীর আখবার মক্কা গ্রন্থের বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬৩।
৭. প্রাগুক্ত পৃ. ৬২।
৮. (সহীহ আল-বুখারী, মানাকিবুল আনসার, বাব ইসলাম আবী যার, খঃ ১, পৃ.ঃ ৫৪৪-৫৪৫)।
৯. (তারীখুল কাবীর, মুহাম্মাদ তাহির আল-কুর্দী, ১ম সংস্করণ মক্কা-১৩৮৫ হিঃ খ, ৩, পৃ. ৬৬-৭১)।
১০. সূরা আস-সফফাত, আয়াতঃ ১০২)।
১১. সূরা মারয়ামঃ ৫৪-৫৫।
১২. ইব্‌ন কুতায়বা; আল-মারিফ, পৃঃ ২০।
১৩. ইব্‌ন কাছীর আল-বিদায়া, খঃ ১, পৃঃ ১৯৩।
১৪. সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৭২।
১৫. সূরা আস-সাফফাত ঃ ১১২।
১৬. আস-সাবূনী, আননু বূওয়াত ওয়াল আম্বিয়া, পৃ. ২৪৪।
১৭. সূরা আল-'আনকাবুত ২৭।
১৮. ইব্‌ন কাছীর আল-বিদায়া, খঃ ১, পৃঃ ১৯৪।

১৯. সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৭২-৭৩।
২০. ইব্‌ন কুতায়বা আদ-দীনওয়ারী, আল-মাওআরিফ, পৃ.ঃ ২৩।
২১. বিদায়া, খঃ ১, পৃ. ১৯৫-১৯৬।
২২. হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন (উর্দু) ৪র্থ সংস্করণ, দিল্লী ১৯৮০, খঃ ১, পৃঃ ২৭৯।
২৩. সূরা শূরাঃ ১৩।
২৪. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া বাব নং ১০-হাদীস নং-৩১৭৩।
২৫. সূরা আলে ইমরানঃ ৬৭।
২৬. সূরা-আল-বাকারা ঃ ১৩২।
২৭. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯।
২৮. সূরা আলে ইমরান-৮৫।
২৯. সূরা আল-বাকারাঃ ৭৫।
৩০. সূরা আন-নেসাঃ ৪৬।
৩১. সূরা আল বাকারা ঃ ৭৯।
৩২. সূরা ইউসুফ ঃ ৯৩।
৩৩. সূরা ইউসুফ ঃ ৯৪।
৩৪. সূরা ইউসুফ ঃ ৯৬-৯৮।
৩৫. বিদায়া খ. ১, পৃ. ২২০।
৩৬. সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩২।
৩৭. সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩৩।
৩৮. সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪০।
৩৯. তাফহীমূল কুরআন, সূরা বাকারার ১৩৫ নং আয়াতের ১৩৫ নং টীকা।
৪০. তাফসীর কুরতুবীঃ খঃ ৫, পৃঃ১৩০।

ইসলামী আইন ও বিচার
অক্টোবর-ডিসেম্বর ঃ ২০০৯
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২০, পৃষ্ঠা ঃ ১২০-১২২

দেশে দেশে ইসলামী আইন

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কুরআনকে মানব জাতির জন্য জীবন বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন। মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থাসহ সকল দিক ও বিভাগের সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের আকর আল কুরআন।

আল কুরআনের সূরা আস শুরার ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রসূলুল্লাহ স. কে উদ্দেশ্য করে বলেন- 'এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই। একদিন আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তার কাছে সবাইকে যেতে হবে।'[১]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রসূলুল্লাহ স. কে মানব জাতির মাঝে 'ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল কুরআন সেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠার গাইড বুক। কুরআন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ সমগ্র মানব জাতির জীবন বিধান হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। যে সমাজে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা শান্তির সমাজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

সূরা আস শুরার ১৫ নং আয়াতকে রেফারেন্স হিসেবে নিয়েছে ব্রিটেনের শরীআহ আদালত। এ আদালত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে-

"Forced Marriages
Domestic Violence
Family Disputes
Forced Marriage (Civil Protection) Act 2007
Notes to the Forced Marriage (Civil Protection)Act 2007
Commercial and Dept Disputes
Inheritance Disputes
Mosque Disputes"[২]

ব্রিটেনে শরীআহ কাউন্সিল

নিম্নোক্ত স্কলারদের নিয়ে ব্রিটেনে শরীআহ কাউন্সিল গঠিত হয়েছে -

ড. সোহাইব হাসান

মাওলানা আবু সাঈদ

মুফতী বারাকাতুল্লাহ[৩]

শরীআহ কাউন্সিলের সদস্যগণ বৈবাহিক বিরোধ, পারিবারিক বিরোধ, বাণিজ্যিক বিরোধ ও মসজিদকেন্দ্রিক উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে ইসলামী সমাধান পেশ করে থাকেন।

শরীআহ আইন সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ঃ

ব্রিটেনের শরীআহ আইন ও আদালত সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মন্তব্য করেছেন। ২০০৮ সালে ইস্ট লন্ডন মসজিদে বক্তব্য দিতে গিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধান বিচারপ্রতি Lord Phillips বলেন "Sharia law Should be used in Britain" অর্থাৎ 'ব্রিটেনে শরীআহ আইন প্রয়োগ হওয়া উচিত'।

ব্রিটেন মুসলিম কাউন্সিলের সদস্য জনাব Inayat Bunglawala বলেন, 'We support these tribunals. If the Jewish courts are allowed to flourish, so must the sharia ones.'[৪]

সম্প্রতি Centre for Social Cohesion এর জরিপে দেখা গেছে, 'ব্রিটেনের ৪০% মুসলিম ছাত্র যুক্তরাজ্যে ইসলামী আইন চায় এবং ৩৩ % ছাত্র সারাবিশ্বে ইসলামী শরীআহ পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা চায়।'[৫]

শরীআহ আইনের অগ্রগতি

আরবিট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৯৬ অনুযায়ী মুসলিম আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল (ম্যাট) আইনগত বৈধতা পেয়েছে যুক্তরাজ্যে। বর্তমান ব্রিটেনের লন্ডন বার্মিংহাম, ব্রাডফোর্ড, ইডেনবার্গ, ম্যানচেস্টার ও ওয়ার উইকশায়ারে মোট ৮৫টি শরীআহ কাউন্সিল রয়েছে। অক্টোবর-০৯ এর পর যুক্তরাজ্যের আরো ১০টি স্থানে এর কার্যক্রম সম্প্রসারন করা হবে। গত ৪ অক্টোবর ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বিভাগের প্রতিনিধিসহ ম্যাটস এর প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৪ জন শরীআহ কাউন্সিলর উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন মতামত পেশ করেন।

ব্রিটেনে শরীআহ আদালতের প্রতি অমুসলিমদের আগ্রহ

ব্রিটেনে ইসলামী শরীআহ আইন এত দিন মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হচ্ছিল এবং এর কার্যক্রমও ছিল সীমিত। বর্তমানে ইউকেতে অমুসলিম নাগরিকরা শরীআহ আইনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। শুধু ধর্মসম্পর্কিত মামলাই নয় বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য সাধারণ

মামলার নিস্পত্তিতেও মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমরা শরীআহ আদালতের দারস্থ হচ্ছেন। এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ম্যাট'স জানায়, তারা যে সব মামলা পরিচালনা করছেন তার ৫ ভাগ অমুসলিমদের। মামলা পরিচালনায় অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলা এবং ব্রিটিশ আইন পদ্ধতির তুলনায় আনুষ্ঠানিকতা কম বলেই এ আদালতের প্রতি মানুষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। ম্যাট'র চেয়ারম্যান জনাব শাইখ ফয়েজ-উল- আকতাব সিদ্দিকী এর মুখপাত্র Freed Chedie জানান, আমরা মৌখিক চুক্তিকে মূল্যায়ন করি, যা ব্রিটিশ আদালত করে না। তা ছাড়া আমাদের আইন ব্রিটিশ আইনের পরিপন্থি নয়। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ব্রিটেন টোক নামের এক অমুসলিম নাগরিক তার ব্যবসার অংশীদার এক মুসলিম ব্যক্তির নামে এ আদালতে মামলা ঠুকে দেন। তাদের মধ্যে মৌখিক চুক্তি হয়েছিল। বিবাদি মুসলমান হওয়ায় চুক্তিটি মূল্যায়ন করা হয় এবং সে অনুসারে বিবাদির কাছ থেকে ৪৮ হাজার পাউন্ডের সমপরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়। উল্লেখ্য এ বছর ম্যাট'স অমুসলিমদের ২০ টি মামলা পরিচালনা করছে।[৬]

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআন সুরা আস শুরা -১৫ আয়াত
২. http://www.mattribunal.com/cases.html
৩. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1031611/Sharia-law-SHOULD-used-Britain-says-UKs-judge.html
৪. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html
৫. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html
৬. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৮ আগস্ট-২০০৯, ১৫ পৃষ্ঠা

লেখক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

১. ত্রৈমাসিক 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকায় লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা ইসলামী আইন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে হতে পারে। তবে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বীমা ও তুলনামূলক আইনী পর্যালোচনাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২. চলিত ভাষায় লিখতে হবে।
৩. গবেষণার নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।
৪. আয়াতের আরবী (হরকতসহ) দিতে হবে এবং সূরা নং ও আয়াত নং উল্লেখ করতে হবে।
৫. হাদীসের ক্ষেত্রে মূল আরবীসহ তরজমা দিতে হবে, কিতাব (অধ্যায়), বাব (অনুচ্ছেদ) নং ও হাদীস নং প্রকাশক ও প্রকাশকালসহ দিতে হবে।
৬. অন্যান্য গ্রন্থের বেলায় লেখক, পুস্তক, খন্ড, প্রকাশক, প্রকাশের কাল ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।
৭. লেখা কাগজের এক পিঠে হতে হবে এবং সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনীয় ফাঁক থাকতে হবে।
৮. লেখা মুদ্রিত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হবে।
৯. অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।
১০. সংস্থার ইমেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠানো যাবে। ই-মেইল প্রেরণ করে সংস্থার অফিসে ফোনে জানাতে হবে।

ই-মেইল- islamiclaw_bd@yahoo.com এবং ফোন- ০১৭১৭ ২২০৪৯৮।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
নোয়াখালী টাওয়ার, (স্যুট-১৩/বি)
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার নতুন বিভাগ

প্রশ্নোত্তর

আগামী সংখ্যা থেকে চালু হচ্ছে
ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।
ইনশাআল্লাহ সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হবে।

- সম্পাদক

০১. রিসার্চ প্রজেক্ট
ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারীতা উপস্থাপন

০২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট
ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

০৩. সেমিনার প্রজেক্ট
ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

০৪. জার্নাল প্রজেক্ট
ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

০৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট
ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

০৬. লেখক প্রজেক্ট
ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবি ভিত্তিক লেখক ফোরাম
গ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

০৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট
ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/ কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/ কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/ কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই / কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/ কিতাব সংগ্রহ

০৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট
ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
গ. ই-লাইব্রেরী
ঘ. আইন ওয়েব সাইট